আগুনের পরশমণি

হুমায়ূন আহমেদ

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

সারাটা সকাল উৎকণ্ঠার ভেতর কাটল 2
দুই সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে 26
রাত্রি সারাদিন খুব গম্ভীর ছিল 38
শরীফ সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন 52
আলমের ঘুম ভাঙল খুব ভোরে 76
ভদ্রলোকের পরনে হাফ হাওয়াই শার্ট 102
রাত্রি ভোরবেলাতেই চলে এসেছে 122
জোনাকি 143

সারাটা সকাল উৎকণ্ঠার ভেতর কাটল

সারাটা সকাল উৎকণ্ঠার ভেতর কাটল। উৎকণ্ঠা এবং চাপা উদ্বেগ। মতিন সাহেব অস্থির হয়ে পড়লেন। গোটে সামান্য শব্দ হতেই কান খাড়া করে ফেলেন, সরু গলায় বলেন, – বিন্তি দেখ তো কেউ এসেছে কী-না।

বিন্তি এ বাড়ির নতুন কাজের মেয়ে। তার কোন ব্যাপারে কোন উৎসাহ নেই, কিন্তু গেট খোলায় খুব আগ্রহ। সে বারবার যাচ্ছে এবং হাসিমুখে ফিরে আসছে। মজার সংবাদ দেয়ার ভঙ্গিতে বলছে, বাতাসে গেইট লড়ে। মানুষজন নাই। দুপুরের পর মতিন সাহেবের উদ্বেগ আরো বাড়ল। তিনি তলপেটে একটা চাপা ব্যথা অনুভব করতে লাগলেন। এই উপসর্গটি তাঁর নতুন। কোন কিছু নিয়ে চিন্তিত হলেই তলপেটে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা হতে থাকে। ডাক্তার-টাক্তার দেখানো দরকার বোধ হয়। আলসার হলে কী এরকম হয়? আলসার হয়ে গেল নাকি?

মতিন সাহেব পাঞ্জাবি গায়ে দিলেন। চুল আঁচড়ালেন। সুরমা অবাক হয়ে বললেন, কোথায় যাচ্ছ তুমি?

এই একটু রাস্তায়।

রাস্তায় কী?

কিছু না। একটু হাঁটর আর কি।

তিনি হাসতে চেষ্টা করলেন।

সুরমার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। গত রাতে তাদের বড় রকমের একটা ঝগড়া হয়েছে। সাধারণত ঝগড়ার পর তিনি কিছুদিন স্বামীর সঙ্গে কোনো কথা বলেন না। আজ তার ব্যতিক্রম হল। তিনি কঠিন গলায় বললেন, তুমি সকাল থেকে এ রকম করছি কেন? কারোর কী আসার কথা?

মতিন সাহেব পাংশু মুখে বললেন–আরে না, কে আসবে? এই দিনে কেউ আসে?

মতিন সাহেব স্ত্রীর দৃষ্টি এড়াবার জন্যে নিচু হয়ে চটি খুঁজতে লাগলেন। সুরমা বললেন, রাস্তায় হাঁটাহাটির কোনো দরকার নেই। ঘরে বসে থাক।

যাচ্ছি না কোথাও। এই গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব।

গেটের বাইরে শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থাকবে কেন?

তিনি জবাব দিলেন না।

স্ত্রীর কথার অবাধ্য হবার ক্ষমতা তার কোনো কালেই ছিল না। কিন্তু আজ অবাধ্য হলেন। হলুদ রঙের একটা পাঞ্জাবি গায়ে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাস্তা ফাঁকা। তিনি পরপর দু'টি সিগারেট শেষ করলেন। এর মধ্যে মাত্র একটা রিকশা গেল। সে রিকশাও ফাঁকা। অথচ কিছুদিন আগেও দুপুর বেলায় রিকশার যন্ত্রণায় হাঁটা যেত না। মতিন সাহেব

রাস্তার মোড় পর্যন্ত গেলেন। ইদ্রিস মিয়ার পানের দোকানের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। ইদ্রিস মিয়া শুকনো গলায় বলল, স্যার ভাল আছেন?

তিনি মাথা নাড়লেন। যার অর্থ হ্যাঁ। কিন্তু মুখের ভাবে তা মনে হল না। তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছে তিনি ভাল নেই।

বিক্রিবাটা কেমন ইদ্রিস?

আর বিক্রি। কিনব কে কেন? কিনার মানুষ আছে?

দেখি একটা পান দাও।

মতিন সাহেবের এখনো দুপুরে খাওয়া হয়নি। এক্ষুণি গিয়ে ভাত নিয়ে বসতে হবে। পান। খাওয়ার কোনো মানে হয় না। কিন্তু একটা দোকানের সামনে শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। ব্যাপারটা সন্দেহজনক। এখন সময় খারাপ। আচার-আচরণে কোন রকম সন্দেহের ছাপ থাকা ঠিক না।

জর্দা দিমু?

দাও।

ইদ্রিস নিষ্প্রাণ ভঙ্গিতে পান সাজাতে লাগল। তার মাথায় ঝুটিবিহীন একটা লাল ফেজ টুপি। কোথেকে জোগাড় করেছে কে জানে। চিবুকের কাছে অল্প দাড়ি। মতিন সাহেব পান মুখে দিয়ে বললেন–দাড়ি রাখছি নাকি ইদ্রিস? ইদ্রিস। জবাব দিল না।

দাড়ি রেখেই ভাল করেছ। যে দিকে বাতাস সেই দিকে পাল তুলতে হয়। পান কত?

দেন যা ইচ্ছা।

ইদ্রিসের গলার স্বরে স্পষ্ট বৈরাগ্য। যেন পানের দাম না দিলেও তার কিছু আসে যায় না। মতিন সাহেব একটা সিকি ফেলে খানিকটা এগিয়ে গেলেন। নিউ পল্টন লাইনের এই গলিটায় বেশ কয়েকটি দোকান। কিন্তু মডার্ন সেলুন এবং পাশের ঘরটি ছাড়া সবই বন্ধ। তিনি মডার্ন সেলুনে ঢুকে পড়লেন। রাস্তায় হাঁটাহঁটি করবার চেয়ে সেলুনে চুল কাটা নিয়ে ব্যস্ত থাকা ভাল। সেলুনটা এক সময় মস্তান ছেলেপুলেদের আড্ডাখানা ছিল। লম্বা চুলের চার-পাঁচটা ছেলে শার্টের বুকের বোতাম খুলে বেঞ্চির ওপর বসে থাকত। সেলুনের একটা এক ব্যান্ড ট্রানজিস্টার সারাক্ষণই বাজত। ট্রানজিস্টারের ব্যাটারির খরচ দিতে গিয়েই সেলুনের লাটে উঠার কথা। কিন্তু তা ওঠেনি। রমরমা ব্যবসা করছে। আজ অবশ্যি জনশূন্য। তবে ট্রানজিস্টার বাজছে। আগের মত ফুল ভলুযমে নয়। মৃদু শব্দে। দেশাত্মবোধক গান। কথা ও সুর নজিবুল হক। মতিন সাহেব বেশ মন দিয়েই গান শুনতে লাগলেন। তবে চোখ রাখলেন রাস্তাব উপর।

চুলটা একটু ছোট কর।

নাপিত ছেলেটি বিস্মিত হল। সে ইনার চুল গত বুধবারেই কেটেছে। আজ আবেক বুধবাব। এক সপ্তাহে চুল বাড়ে দুই সুতা। তার জন্যে কেউ চুল কাটাতে আসে না।

স্যার চুল কাটাবেন?

কুঁ। পিছনের দিকে একটু ছোট কবি। কী নাপিতেব কাচি যন্ত্রের মত খটখট করতে লাগল। মতিন সাহেব বললেন–দেশের হালচাল কী?

ভালই।

চুল কাটতে এলে এই ছোকরার কথার যন্ত্রণায় অস্থির হতে হয়। কথা শুনতে তার খারাপ লাগে না। কিন্তু এই ছোকরা কথা বলার সময় থুথুর ছিটা এসে লাগে। আজ সে নিশ্চুপি। থুথু গায়্যে লাগাব কোন আশংকা নেই।

দাম দেবার সময় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, রাতদিন ট্রানজিস্টার চালাও কিভাবে? ব্যাটাবিব তো মেলা দাম। নাপিত ছোকরা জবাব দিল না। গম্ভীর মুখে টাকা ফেবত দিয বেঞ্চিব উপর পা তুলে বসে রইল। মতিন সাহেব বললেন, আজ কার্ফু কটা থেকে জানো নাকি?

জানি, ছয়টায়।

এক ঘণ্টা পিছিয়ে দিল, ব্যাপারটা কী?

ঝামেলা নাই। গণ্ডগোল নাই। কার্ফুও নাই।

তা তো ঠিকই। এখন হয়েছে ছটা, তারপর হবে সাতটা, আটটা; কী বল?

তিনি কোনো উত্তর পেলেন না। ছেলেটা ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে। আজকাল কেউ বাড়তি কথা বলতে চায না। চেনা মানুষদের কাছেও না।

রোদ উঠেছে কড়া এবং ঝাঁঝাল। কিন্তু এই কড়া রোদেও তার কেমন শীত শীত করতে লাগল। তিনি ইদ্রিস মিয়ার দোকানের সামনে দ্বিতীয়বার এসে দাঁড়ালেন। মনে করতে চেষ্টা করলেন ঘরে যথেষ্ট সিগারেট আছে কিনা। পাঁচটার পর কোথাও কিছু পাওয়া যাবে না। গত সোমবারে সিগারেটের অভাবে খুব কষ্ট করেছেন। রাত নটার সময় বিন্তি এসে বলল, সিগারেটের প্যাকেট খুঁইজা পাই না। কি সর্বনাশ! বলে কী! তার মাথায় রক্ত উঠে গেল। অমানিশি কাটবে কিভাবে? এটা ফ্ল্যাট বাড়ি না। ফ্ল্যাট বাড়ি হলে অন্যদের কাছে খোঁজ করা যেত। তবু তিনি রাত দশটার সময় পাচিলের কাছে দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির উকিল সাহেবকে চিকন সুরে ডাকতে লাগলেন–ফরিদউদ্দিন সাহেব, সিগারেট আছে? সুরমা এসে তাকে টেনে ভেতরে নিয়ে গেলেন। রেগে আগুন হয়ে বললেন, মাথা কী খারাপ হয়ে গেছে? একটা রাত সিগারেট না ফুঁকলে কী হয়?

মতিন সাহেব মানিব্যাগ খুললেন। ইদ্রিস মিয়া তার দোকানে আগরবাতি জ্বলিয়েছে। সব দোকানদারের মধ্যে এই একটি নতুন অভ্যাস দেখা যাচ্ছে। আগরবাতি জ্বালানো। আগে কেউ কেউ সন্ধ্যাবেলা জ্বালাত। এখন প্রায় সারাদিনই জ্বলে। আগরবাতির গন্ধ মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়। মতিনউদ্দিন সাহেব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

ইন্দ্রিস, দুই প্যাকেট ক্যাপস্টান দাও।

ইদ্রিস সিগারেট বের করল। দাম এক টাকা করে বেশি নিল। সিগারেটের দাম চড়ছে। ছেলে-ছোকরারা এখন সারাদিন ঘরে বসে থাকে এবং সিগারেট ফুকে। এছাড়া আর কী করবে?

দু'টা ম্যাচও দাও।

ইদ্রিস মিয়া ম্যাচ দিতে দিতে বলল, আফনে কাউরে খুঁজতেছেন?

তিনি চমকে উঠলেন। বলে কী এই ব্যাটা? টের পেল কিভাবে?

কারে খুঁজেন?

আরে না, কাকে খুঁজবে? চুল কাটাতে গিয়েছিলাম। চুল একটু বড় হলেই আমার অসহ্য লাগে।

তিনি বাড়ির দিকে রওনা হলেন। গোরস্থান ঘেষে রাস্তা গিয়েছে। সেই জন্যেই কী গা ছমছম করে? না অন্য কোনো কারণ আছে? একটা কটু গন্ধ আসছে। নিউ পল্টন লাইনের লোকজনদের ধারণা, বর্ষাকালে এই গন্ধ পাওয়া যায়। লাশ পচে গন্ধ ছড়ায়। এখন বর্ষাকাল। গোরস্থানের পাশে বাড়ি ভাড়া নেয়াটা ভুল হয়েছে। বিরাট ভুল।

বিন্তি গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। মতিন সাহেবকে দেখে সে দাঁত বের করে হাসল। এই মেয়েটার হাসি-রোগ আছে। যখন-তখন যার-তার দিকে তাকিয়ে হাসবে। অভদ্রের চূড়ান্ত। কড়া ধমক দিতে হয়। তিনি ধমক দিতে গিয়েও দিলেন না। সোজা ঘরে ঢুকে খেতে বসলেন।

সুরমা ও বসেছেন। কিন্তু তিনি কিছু খাচ্ছেন না। ঝগড়া-টগড়ার পর তিনি খাওয়া-দাওয়া আলাদা করেন। মাঝে মাঝে করনেও না। মতিন সাহেব ভাত মাখতে মাখতে বললেন, আজ কার্য্য ছয়টা থেকে। সুরমা তীক্ষা কণ্ঠে বললেন, তাতে কী?

না কিছু না। এমনি বললাম। কথার কথা।

আজ অফিসে গেলে না কেন?

শরীরটা ভাল না।

একটা সত্যি কথা বল তো, কেউ কী আসবে?

তিনি বিষম খেলেন। পানি-টানি খেয়ে ঠাণ্ডা হতে তাঁর সময় লাগল। সুরমা তাকিয়ে আছেন। তাঁর মুখ কঠিন। মতিন সাহেব ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। এক সময়ে সুরমার এই মুখ খুব কোমল ছিল। কথায় কথায় রাগ করে কেঁদে ভাসাত। একবার তাকে এক সপ্তাহের জন্যে রাজশাহী যেতে হবে। সুরমা গাম্ভীর হয়ে আছে। কথাটথা বলছে না। রওনা হবার আগে আগে এমন কান্না! মতিন সাহেব বড় লজ্জার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। বাড়ি ভর্তি লোকজন। এদের মধ্যে মেজো ভাবীও আছেন। মেজো ভাবীর মুখ খুব আলগা। তিনি নিচু গলায় বাজে ধরনের একটা রসিকতা করলেন। কী অস্বস্তি। পাঁচশ বছর খুব কী দীর্ঘ সময়? এই সময়ের মধ্যে একটি কোমল মুখ চিরদিনের জন্যে কঠিন হয়ে যায়?

কি, কথা বলছি না কেন?

কী বলবি?

কারোর কী আসার কথা?

আরে না, কে আসবে?

সত্যি করে বল।

মতিন সাহেব থেমে থেমে বললেন, ইয়ে আমার এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয়।

কে সে?

তুমি চিনবে না।

তোমার আত্মীয় আর আমি চিনব না—কী বলছ এ সব?

দেখা-সাক্ষাৎ নেই তো। আমি নিজেই ভাল করে চিনি না।

তুমি নিজেও চেন না?

সুরমার কপালে ভাঁজ পড়ল। মতিন সাহেব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তিনি মৃদু স্বরে বললেন, দুই-এক দিন থাকবে। তারপর চলে যাবে। নাও আসতে পারে। ঠিক নাই কিছু। না আসারই সম্ভাবনা।

সে করে কী?

জানি না।

জানি না মানে?

বললাম তো আমি নিজেও চিনি না ভাল করে। যোগাযোগ নেই।

মতিন সাহেব উঠে পড়লেন। সাধারণত ছুটির দিনগুলিতে তিনি খাওয়া-দাওয়ার পর গল্পের বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন। আজ ছুটির দিন নয়। কিন্তু তিনি অফিসে যাননি। কাজেই দিনটিকে ছুটির দিন হিসাবে ধরা যেতে পারে। তার উচিত একটা বই নিয়ে বিছানায় চলে যাওয়া। তিনি তা করলেন না। বই হাতে বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসলেন। চোখ রাস্তার দিকে।

দিনের আলো আসছে। আকাশে মেঘা জমতে শুরু করেছে। পর পর কয়েকদিন খটখাটে রোদ গিয়েছে। এখন আবার কয়েকদিনের ক্রমাগত বৃষ্টি হবার কথা। বাড়ির ভেতরে সুরমা বসেছে তার সেলাই মেশিন নিয়ে। বিশ্রী ঘটাং ঘটাং শব্দ হচ্ছে। মতিন সাহেবের ঘুম পেয়ে গেল। হাতে ধরে থাকা বইটির লেখাগুলি ঝাপসা হয়ে উঠেছে। ঝাপসা এবং অস্পষ্ট। রোদ নেই। একেবারেই। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। বৃষ্টি হবে, জোর বৃষ্টি হবে। তিনি বই বন্ধ করে আকাশের দিকে তাকালেন। বাদলা দিনে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান। সুরমা ক্রমাগতই খটখট করে যাচ্ছে। কিসের তার এত সেলাই? আচ্ছা ছেলেবেলায় সুরমা কেমন ছিল? প্রতিটি মানুষ একেক বয়সে একেক রকম। যৌবনে সুরমা কত মায়াবতী ছিল। বর্ষার রাতগুলি তাঁরা গল্প করে পার করে দিতেন। একবার খুব বর্ষা হল। খোলা জানালায়

বৃষ্টির ছাঁট এসে বিছানা ভিজিয়ে একাকার করেছে। তবু তাঁরা জানালা বন্ধ করলেন না। ভেজা বিছানায় শুয়ে রইলেন। হাওয়া এসে বারবার মশারিকে নৌকার পালের মত ফুলিয়ে দিতে লাগল। কত গভীর আনন্দেই না কেটেছে তাদের যৌবন। মতিন সাহেব কালো আকাশেব দিকে তাকিয়ে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

যখন ঘুম ভাঙল তখন চারদিক অন্ধকার। টিপটপ বৃষ্টি পড়ছে। দমকা বাতাস দিচ্ছে। তিনি খোঁজ নিলেন–কেউ এসেছে কী-না। কেউ আসেনি। কার্ফু শুরু হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। এখন আব আসার সময় নেই। কাল কি আসবে? বোধহয় না। শুধু শুধুই অপেক্ষা করা হল। তিনি শোবার ঘরে উঁকি দিলেন। সুরমা ঘুমুচ্ছে। একটা সাদা চাদরে তার শরীর ঢাকা। তাকে কেমন অসহায় দেখাচ্ছে। মতিন সাহেব কোমল গলায় ডাকলেন, সুরমা সুরমা। সুরমা পাশে ফিরলেন।

ঘড়িতে সাড়ে পাঁচ বাজে। কার্ফু শুরু হতে এখনো আধা ঘণ্টা বাকি। কিন্তু এর মধ্যেই চারদিক জনশূন্য। লোকজন যার যার বাড়ি ফিরে গেছে। বাকি রাতটায় আর ঘর থেকে বেরুবে না। ইদ্রিস মিয়া তার দোকান বন্ধ করার জন্যে উঠে দাঁড়াল। রোজ শেষ মুহূর্তে কিছু বিক্রিবাটা হয়। আজ হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না কে জানে? অন্ধকার দেখে সবাই ভাবছে বোধ হয়। কার্ফুর সময় হয়ে গেছে। সময় না হলেও কিছু যায় আসে না। আজকাল সবাই অন্ধকারকে ভয় পায়। ইদ্রিস মিয়া দোকানের তালা লাগাবার সময় লক্ষ্য করল গলির ভেতরে লম্বা একটি ছেলে ঢুকছে। তার হাতে কয়েকটা পত্রিকা। হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে বাসার নম্বর পড়তে পড়তে আসছে। ইদ্রিস মিয়ার দোকানের সামনে এসে সে থমকে দাঁড়াল। ইদ্রিস মিয়া বলল, আপনি কী মতিন সাহেবের বাড়ি খুঁজছেন?

ছেলেটি তাকাল বিস্মিত হয়ে। কিছু বলল না। ইদ্রিস বাড়ি দেখিয়ে দিল। নিচু গলায় বলল, লোহার গেইট আছে। গেটের কাছে একটা নারকেল গাছ। তাড়াতাড়ি যান। ছাঁটার সময় কাফু।

ইদ্রিস মিয়া হন।হন করে হাঁটতে লাগল। একবারও পেছনে ফিরে তাকাল না। ছেলেটি তাকিয়ে রইল ইদ্রিস মিয়ার দিকে। লোকটি ছোটখাট। প্রায় দৌড়াচ্ছে। সে নিশ্চয়ই অনেকখানি দূরে থাকে। ছটার আগে তাকে পৌঁছতে হবে।

ছেলেটি এগিয়ে গেল। লোহার গেটের বাড়িটির সামনে দাঁড়াল। নারকেল গাছ দু'টি বন্ধুকে আছে রাস্তার দিকে। প্রচুর নারকেল হয়েছে। ফলের ভরে যেন গাছ হেলে আছে। দেখতে বড় ভাল লাগে। ছেলেটি গেটে টোকা দিয়ে ভারী গলায় ডাকল, মতিন সাহেব, মতিনউদ্দিন সাহেব। বয়সের তুলনায় তার গলা ভারী। ছেলেটির নাম বদিউল আলম। তিন মাস পর সে এই প্রথম ঢুকেছে ঢাকা শহরে।

জুলাই মাসের ছ’ তারিখ। বুধবার। উনিশ শো একাত্তুর সন। একটি ভয়াবহ বছর। পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর কঠিন মুঠির ভেতরে একটি অসহায় শহর। শহরের অসহায় মানুষ। চারদিকে সীমাহীন অন্ধকার। সীমাহীন ক্লান্তি। দীর্ঘ দিবস এবং দীর্ঘ রজনী।

বদিউল আলম গেট ধরে দাঁড়িয়েছে। সে শহরে ঢুকেছে সাতজনের একটি ছোট্ট দল নিয়ে। শহরে গেরিলা অপারেশন চালানোর দায়িত্ব তার। ছেলেটি রোগা। চশমায় ঢাকা বড় বড় চোখ। গায়ে হালকা নীল রঙের হাওয়াই শার্ট। সে একটি রুমাল বের করে কপাল মুছে দ্বিতীয়বার ডাকল, মতিন সাহেব! মতিন সাহেব!

মতিন সাহেব দরজা খুলে বের হলেন। দীর্ঘ সময় অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ছেলেটির দিকে। এ তো নিতান্তই বাচ্চা ছেলে। এরই কী আসার কথা?

আমার নাম বদিউল আলম।

আস বাবা, ভেতরে আস।

এই সামান্য কথা বলতে গিয়ে মতিন সাহেবের গলা ধরে গেল। চোখ ভিজে উঠল। এত আনন্দ হচ্ছে! তিনি চাপা স্বরে বললেন, কেমন আছ তুমি?

ভাল আছি।

সঙ্গে জিনিসপত্র কিছু নেই?

না।

বল কী!

সুরমা দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। পর্দা সরিয়ে তাকিয়ে আছেন। মতিন সাহেব বললেন, আস, ভেতরে আস। দাঁড়িয়ে আছে কেন?

গোটটা বন্ধ। গেট খুলুন।

ও আচ্ছা আচ্ছা।

মতিন সাহেব সংকুচিত হয়ে পড়লেন। সাড়ে পাঁচটার দিকে গেটে তালা দিয়ে দেয়া হয়।

চাবি থাকে সুরমার কাছে। সুরমা আঁচল থেকে চাবি বের করলেন। গেটে তালা দিয়ে রাখি। আগে দিতাম না। এখন দেই। অবশ্যি চুরি-ডাকাতির ভয়ে না। চুরি-ডাকাতি কমে গেছে। চোরডাকাতরা এখন কিভাবে বেঁচে আছে কে জানে। বোধ হয় কষ্টে আছে।

বদিউল আলম বসবার ঘরে ঢুকল। মতিন সাহেবের মনে হল এই ছেলেটির কোনো দিকেই কোনো উৎসাহ নেই। সোফাতে বসে আছে কিন্তু কোনো কিছু দেখছে না। বসার ভঙ্গির মধ্যেই গাছেড়ে-দেয়া ভাব আছে। মতিন সাহেব নিজের মনের কথা বলে যেতে লাগলেন, কয়েকদিন ধরে আমরা স্বামী-স্ত্রী আছি। এই বাড়িতে। আমাদের দুই মেয়ে আছে–রাত্রি আর অপালা। ওরা তার ফুফুর বাড়িতে। সোমবারে আসবে। ওদের ফুফু, মানে আমার বোনের কোন ছেলেপুলে নেই। মাঝে-মধ্যে রাত্রি আর অপালাকে নিয়ে যায়। ওরাও তাদের ফুফুর খুব ভক্ত। খুবই ভক্ত।

বদিউল আলম কিছু বলল না। তাকিয়ে রইল। মতিন সাহেব খানিকটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। গলা পরিষ্কার করে বললেন – অবস্থা কি বল শুনি।

কিসের অবস্থা?

তোমরা যেখানে ছিলে সেখানকার অবস্থা।

ভালই।

আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। বাঘের পেটের ভেতর আছি। কাজেই বাঘটা কী করছে না করছে বোঝার উপায় নেই। বাঘ মারা না পড়া পর্যন্ত কিছুই বুঝব না। মারা পড়ার পরই পেট থেকে বের হব।

মতিন সাহেবের এটা একটি প্রিয় ডায়ালগ। সুযোগ পেলেই এটা ব্যবহার করেন। শ্রোতারা তখন বেশ উৎসাহী হয়ে তাকায়। কয়েকজন বলেই ফেলে–ভাল বলেছেন। কিন্তু এবারে সে রকম কিছু হল না। মতিন সাহেবের ভয় হল ছেলেটা হয়ত শুনছেই না।

তুমি হাত-মুখ ধুয়ে আসা। চায়ের ব্যবস্থা করছি।

চা খাব না। ভাতের ব্যবস্থা করুন, যদি অসুবিধা না হয়।

না না, অসুবিধা কিসের? কোনো অসুবিধা নেই। খাবার-টাবার গরম করতে বলে দেই।

গরম করবার দরকার নেই। যেমন আছে দিন।

মতিন সাহেব অপ্রস্তুত হয়ে উঠে গেলেন। একজন ক্ষুধার্তা মানুষের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে বকবক করছিলেন। খুব অন্যায়। খুবই অন্যায়।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে ছেলেটির প্রসঙ্গে সুরমা কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। যেন দেখবার পর তাঁর সব কৌতূহল মিটে গেছে। ভাত খাওয়ার সময় নিজেই দু'একটা বললেন। যেমন একবার বললেন, তুমি মনে হচ্ছে ঝাল কম খাও। ছেলেটি তার জবাবে

অন্য এক রকম ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। দ্বিতীয়বারে বললেন, ছোট মাছ তুমি খেতে পারছি না দেখি। আস্তে আস্তে খাও, আমি একটা ডিম ভেজে নিয়ে আসি।

ছেলেটি এই কথায় খাওয়া বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইল। ভাজা ডিমের জন্য প্রতীক্ষা। ব্যাপারটা মতিন সাহেবের বেশ মজার মনে হল। সাধারণত এই পরিস্থিতিতে সবাই বলে– না না লাগবে না। লাগবে না।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতেই বদিউল আলম বলল, আমাকে শোবার জায়গা দেখিয়ে দিন। মতিন সাহেব বললেন, এখুনি শোবে কী? বাস, কথাবার্তা বলি। স্বাধীন বাংলা বেতার শুনবে না?

জি না। স্বাধীন বাংলা বেতার শুনবার আমার কোন আগ্রহ নেই।

বল কী তুমি! কখনো শোন না?

শুনেছি মাঝে মাঝে।

তিনি খুই ক্ষুণ্ণ হলেন। ছেলেটি স্বাধীন বাংলা বেতার শোনে না সে কারণে নয়। ক্ষুণ্ণ হলেন কারণ খাওয়া শেষ করেই সে একটা সিগারেট ধরিয়েছে। বলতে গেলে এ তার ছেলের বয়েসী। একজন বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষের সামনে এ রকম ফাট করে সিগারেট ধরানো ঠিক না। তা ছাড়া ছেলেটি দুবার কথার মধ্যে তাকে বলেছে মতিন সাহেব। এ কী কাণ্ড! চাচা বলবে। যদি বলতে খারাপই লাগে কিছু বলবে না। কিন্তু মতিন সাহেব বলবে কেন? তিনি কী তার ইয়ার দোস্তদের কেউ? এ কেমন ব্যবহার?

ঘর ঠিকঠাক করলেন সুরমা। রাত্রি ও অপালার পাশের ছোট ঘরটায় ব্যবস্থা হল। বিন্তির ঘর। বিন্তি ঘুমুবে বারান্দায়। এ ঘরটা ভঁড়ার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পরিষ্কার করতে সময় লাগল। তবু পুরোপুরি পরিষ্কার হল না। চৌকির নিচে রসুন ও পেয়াজ। বস্তায় ভর্তি চাল-ডাল। এসব থেকে কেমন একটা টকটক গন্ধ ছড়াচ্ছে। সুরমা বললেন, তুমি এ ঘরে ঘুমুতে পারবে তো? না পারলে বল আমি বসার ঘরে ব্যবস্থা করে দেই। একটা ক্যাম্প খাট আছে। পেতে দিব।

লাগবে না।

বাথরুম কোথায় দেখে যাও।

বৈদিউল আলম বাথরুম দেখে এল।

কোনো কিছুর দরকার হলে আমাকে ডাকবে।

আমার কোনো কিছুর দরকার হবে না।

সুরমা চৌকির এক প্রান্তে বসলেন। বসার ভঙ্গিটা কঠিন। বদিউল আলম কৌতূহলী হয়ে তাকে দেখল।

আপনি কী আমাকে কিছু বলতে চান?

হ্যাঁ।

বলুন।

তুমি কে আমি জানি না। কোথেকে এসেছ তাও জানি না। কিন্তু কি জন্যে এসেছ তা আন্দাজ করতে পারি।

আন্দাজ করবার দরকার নেই। আমি বলছি কি জন্যে এসেছি। আপনাকে বলতে আমার কোনো অসুবিধা নেই।

তোমার কিছু বলার দরকার নেই। আমি তোমাকে কি বলছি সেটা মন দিয়ে শোন।

বলুন।

তুমি সকালে উঠে এখান থেকে চলে যাবে।

ছেলেটি কিছু বলল না। তাঁর দিকে তাকালও না।

দু'টি মেয়ে নিয়ে আমি এখানে থাকি। কোনো রকম ঝামেলার মধ্যে আমি জড়াতে চাই না।

রাত্রির বাবা আমাকে না জিজ্ঞেস করে এসব করেছে। তুমি কী বুঝতে পারছি আমি কি বলতে চাচ্ছি?

পারছি।

তুমি কাল সকালে চলে যাবে।

কাল সকালে যাওয়া সম্ভব না। সব কিছু আগে থেকে ঠিকঠাক করা। মাঝখান থেকে হুঁট করে কিছু বদলানো যাবে না। আমি এক সপ্তাহ এখানে থাকব। আমার সঙ্গে যারা যোগাযোগ করবে: তারা এই ঠিকানাই জানে।

সুরমা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। কি রকম উদ্ধত ভঙ্গিতে সে কথা বলছে। এ কি কাণ্ড!

তোমার জন্যে আমি আবার মেয়েগুলিকে নিয়ে বিপদে পড়ব? এসব তুমি কি বলছ?

বিপদে পড়বেন কেন? বিপদে পড়বেন না। এক সপ্তাহের মধ্যে আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে। এর পরের বার আমি এখানে উঠিব না। আর আপনার মেয়েরা তাদের ফুফুর বাড়িতে থাকুক। এক সপ্তাহ পর আসবে।

তুমি থাকবেই?

হ্যাঁ। অবশ্যি আপনি যদি ভয় দেখান আমাকে ধরিয়ে দেবেন, সেটা অন্য কথা। তা দেবেন। না। সেটা বুঝতে পারছি।

সুরমা উঠে দাঁড়ালেন। যে ছেলেটিকে এতক্ষণ লাজুক এবং বিনীত মনে হচ্ছিল এখন তাকে দুর্বিনীত অভদ্র একটি ছেলের মত লাগছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে ছেলেটির এই রূপটিই তার ভাল লাগল। কেন লাগল। তিনি বুঝতে পারলেন না।

আলম।

বলুন।

ঢাকা শহরে কী তোমার বাবা-মারা থাকেন?

হ্যাঁ থাকেন।

কোথায় থাকেন?

শহরেই থাকেন।

বলতে কী তোমার অসুবিধা আছে?

হ্যা আছে।

তুমি এক সপ্তাহ থাকবে?

হ্যাঁ।

সুরমা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। ঘন অন্ধকাবে নগরী ডুবে গেল। বুম বৃষ্টি নামল। সুরমা লক্ষ্য করলেন ছেলেটি বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। লাল আগুনের ফুলকি উঠানামা করছে।

মতিন সাহেব শোবার ঘরে ট্রানজিস্টার কানে লাগিয়ে বসে আছেন। ‘চরমপত্র’ শোনা যাচ্ছে। এটি তাকে দেখে যে-কেউ বলে দিতে পারবে। তিনি তীব্র কণ্ঠে কিছুক্ষণ পরপরই বলছেন, মার লেংগী। মার লেংগী শব্দটি তার নিজের তৈরি কিবা। একমাত্র চরমপত্র শোনার সময়ই তিনি এটা বলে থাকেন।

সুরমা মোমবাতি নিয়ে ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, কুমিল্লা সেক্টরে তো অবস্থা কেরোসিন করে দিয়েছে। লেংগী মেরে দিয়েছে বলেই খেয়াল হল। এই জাতীয় কথাবার্তা সুরমা সহ্য করতে পারে না। তিনি আশংকা করতে লাগলেন সুরমা কড়া কিছু বলবে। কিন্তু সে কিছুই বলল না।

সুরমা যথেষ্ট সংযত আচরণ করছে বলে তাঁর ধারণা। এখনো ছেলেটিকে নিয়ে কোন হৈচৈ করেনি। প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেছে। কাজেই আশা করা যায় বাকিগুলিও কাটবে। অবশ্যি ছেলের আসল পরিচয় জানলে কি হবে বলা যাচ্ছে না। প্রয়োজন না হলে পরিচয় দেয়ারই বা দরকার কী? কোন দরকার নেই।

স্বাধীন বাংলা থেকে দেশাত্মবোধক গান হচ্ছে। তিনি গানের তালে তালে পা ঠুকতে লাগলেন–ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা। আমাদের এই বসুন্ধরা। তার চোখ ভিজে উঠল। এইসব গান আগে কতবার শুনেছেন কখনো এ রকম হয়নি। এখন যতবার শোনেন চোখ ভিজে উঠে। বুক হুঁ-হু করে।

রেডিওটা কান থেকে নামাও।

মতিন সাহেব ট্রানজিস্টারটা বিছানার উপর রাখলেন। নিজে থেকে কোনো প্রশ্ন করতে সাহসে কুলাচ্ছে না। সুরমা বললেন, কাল তুমি তোমার বোনের বাসায় গিয়ে বলে আসবে রাত্রি এবং অপালা যেন এক সপ্তাহ এখানে না আসে।

কেন?

তোমাকে বলতে বলছি, তুমি বলবে। ব্যস। এই মাসটা ওরা সেখানেই থাকুক।

আচ্ছা বলব।

আরেকটা কথা।

বল।

ভবিষ্যতে কখনো আমাকে জিজ্ঞেস না করে কিছু করবে না।

আচ্ছা। এক কাপ চা খাওয়াবে?

এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে সুরমাকে সামনে থেকে সবিয়ে দেয়া। সে বসে থাকা মানে স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে বঞ্চিত হওয়া।

রাত দশটায় ভয়েস অব আমেরিকা থেকেও একটা ভাল খবর পাওয়া গেল। পূর্ব রণাঙ্গনে বিদ্রোহী সৈন্য এবং পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর ভেতর খণ্ড যুদ্ধ হয়েছে বলে অসমর্থিত খবরে

জানা গেছে। তবে পূর্ব পাকিস্তানে সমগ্র ছোট বড় শহরে পাকিস্তানি বাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে। আমেরিকান দু'জন সিনেটর ঐ অঞ্চলের ব্যাপক প্রাণহানিব খবরে উদ্বেগ প্রকাশ কবেছে। সংকট নিরসনের জন্যে আশু পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে তারা মনে করেন।

ভাল খবর হচ্ছে পূর্ব রণাঙ্গনে খণ্ড যুদ্ধ। আমেরিকানদের খবর। এরা তো আর না জেনেশুনে কিছু বলছে না। জেনেশুনেই বলছে। রাত্রি নেই, সে থাকলে এসব খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারতেন। টেলিফোনটাও নষ্ট হয়ে আছে। ঠিক থাকলে ইশারা-ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করা যেত সে ভয়েস অব আমেরিকা শুনছে। কিনা।

মতিন সাহেব রেডিও পিকিং ধরতে চেষ্টা করতে লাগলেন। পাশাপাশি অনেকগুলি জায়গায় চ্যাং চ্যাং চিন মিন শব্দ হচ্ছে। এর কোনো একটি রেডিও পিকিংয়ের এক্সটারনাল সার্ভিস। কোনটা কে জানে। রাত এগারোটায় রেডিও অস্ট্রেলিয়া। মাঝে মাঝে রেডিও অস্ট্রেলিয়া খুব পরিষ্কার ধরা যায়। তারা ভাল ভাল খবর দেয়।

তিনি নব ঘুরাতে লাগলেন খুব সাবধানে। তার মন বেশ খারাপ। বিবিসির খবর শুনতে পারেননি। খুব ডিসটারবেন্স ছিল। একটা ভাল ট্রানজিস্টার কেনা খুবই দবকার।

রাত সাড়ে দশটায় ইলেকট্রিসিটি এল। সুবামা লক্ষ্য করল ছেলেটি বারান্দায় রাখা চেয়ারটায় বসে আছে। সারাটা সময় কি এখানেই বসে ছিল? না ঘুমিয়ে পড়েছে বসে থাকতে থাকতে? তিনি এগিয়ে গেলেন। না ঘুমায়নি। জেগেই আছে। চোখে চশমা নেই বলে অন্য রকম লাগছে।

আলম, তোমার কি ঘুম আসছে না?

জি না।

গরম দুধ বানিয়ে দেব এক গ্লাস? গরম দুধ খেলে ঘুম আসে।

দিন।

সুরমা দুধের গ্লাস নিয়ে এসে দেখেন ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে ডেকে তুলতে তার মায়া লাগল। তিনি বারান্দায় বাতি নিভিয়ে অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে।

আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। একটি দু’টি করে তারা ফুটতে শুরু করেছে।

দুই সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে

দুই সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে একটি অচেনা বাড়িতে দু'দিন কেটে গেল। দু'দিন এবং তিনটি দীর্ঘ রাত। আজ হচ্ছে তৃতীয় দিনের সকাল। আলম পা বুলিয়ে বসে আছে। কাজের মেয়েটি এক কাপ চা দিয়ে গেছে। সে চায়ে চুমুক দেয়নি। ইচ্ছে করছে না। অস্থির লাগছে। পেয়াজ-রসুনের গন্ধটা সহ্য হচ্ছে না। সূক্ষ্ম যন্ত্রণা হচ্ছে মাথায়। এই যন্ত্রণার উৎস নিশ্চয়ই পেঁয়াজ রসুনের গন্ধ নয়। সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার জন্যেই এ রকম হচ্ছে। দাম আটকে আসছে।

কথা ছিল সাদেক তার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। যেদিন সে ঢাকা এসে পৌঁছেছে তার পরদিনই। যোগাযোগটা হবার কথা কিন্তু এখনো সাদেকের কোনো খোঁজ নেই। ধরা পড়ে গেল নাকি? দলের একজন ধরা পড়ার অর্থই হচ্ছে প্রায় সবারই ধরা পড়ে যাওয়া। এ কারণেই কেউ কারোর ঠিকানা জানে না। কাজের সময়ই সবাই একত্র হবে। তারপর আবার ছড়িয়ে পড়বে। ঝিকাতলার একটি বাসায় কনট্রাক্ট পয়েন্ট। সেখানেও যাবার হুকুম নেই। নিতান্ত জরুরি না হলে কেউ সেখানে যাবে না।

সবার দায়িত্ব ভাগাভাগি করা আছে। মালমশলা জায়গামত পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব রহমানের। সেগুলি নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছে। রহমান অসাধ্য সাধন করতে পারে। রহমানকে যদি বলা হয়— রহমান, তুমি যাও তো, সিংহের লেজটা দিয়ে কান চুলকে আসা। সে তা পারবে। সিংহ সেটা বুঝতেও পারবে না। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে-রহমান অসম্ভব ভীতু ধরনের ছেলে। এ জাতীয় দলে ভীতু ছেলেপুলে রাখাটা ঠিক না। কিন্তু রহমানকে রাখতে হয়েছে।

আলম খাট থেকে নামল। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে চায়ে চুমুক দিল। ঠাণ্ডা চা। সার পড়ে গিয়েছে। ঠাণ্ডার জন্যেই মিষ্টি বেশি লাগছে। বমি বমি ভাব এসে গেছে। সে আবার বিছানায় গিয়ে বসল। কিছু করবার নেই। এ বাড়ির ভদ্রমহিলা। গতকাল বিশাল এক উপন্যাস দিয়ে গেছেন। অচিন্তকুমার সেনগুপ্তের প্রথম কদম ফুল। প্রেমের উপন্যাস। প্রেম নিয়ে কেউ এত বড় একটা উপন্যাস ফাদতে পারে ভাবাই যায় না। কাকলী নামেব একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে একটি ছেলের। এই রকমই গল্প। কোনো সমস্যা নেই, কোনো ঝামেলা নেই–সুখের গল্প। পড়তে ভাল লাগছে না। তবু ছাপন্ন পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়া হয়েছে। আবার বইটি নিয়ে বসবে কিনা আলম মনস্থির করতে পারল না।

পাশের ঘর থেকে সেলাই মেশিনের খাটাং খটাং শব্দ হচ্ছে। মেশিন চলছে তো চলছেই। রাতদিন এই মহিলা কি এত সেলাই করেন কে জানে? ক্লান্তি বলেও তো একটা জিনিস মানুষের আছে। খট খাট খাটাং চলছে তো চলছেই। গতকাল রাত এগারোটা পর্যন্ত এই কাণ্ড।

আলম হাত বাড়িয়ে 'প্রথম কদম ফুল' টেনে নিল। ছাপন্ন পৃষ্ঠা খুঁজে বের করতে ইচ্ছা করছে না। যে কোনো একটা জায়গা থেকে পড়তে শুরু করলেই হয়। তার আগে একবার বাথরুমে যেতে পারলে ভাল হত। এটা একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার। দু'টি বাথরুম এ বাড়িতে। একটি অনেকটা দূরে সার্ভেন্টস বাথরুম। অন্যটি এদের শোবার ঘরের পাশে। পুরোপুরি মেয়েলি ধরনের বাথরুম। ঝকঝাক তকতক করছে। ঢুকলেই এয়ার ফেশনাবেব মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায়। বিশাল একটি আয়না। আয়নার নিচেই মেয়েলি সাজসজার জিনিস। চমৎকার করে গোছানো। আয়নার ঠিক উল্টোদিকে একটি জলরঙ ছবি ফ্রেমে বাঁধানো। গামছা পরা দু'টি বালিকা নদীতে নামছে। চমৎকার ছবি। আয়নার ভেতর দিয়ে এই ছবিটি

দেখতে বড় ভাল লাগে। এ জাতীয় একটি বাথরুম বাইরের অজানা-অচেনা এক মানুষের জন্যে নয়।

আলম বই নামিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আর ঠিক তখনই সেলাই মেশিনের শব্দ থেমে গেল। সে এই ব্যাপারটি আগেও লক্ষ্য করেছে। ঘর থেকে বেরুলেই ভদ্রমহিলা সেলাই থামিয়ে অপেক্ষা করেন। কিভাবে তিনি যেন টের পেয়ে যান। আলম বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই সুরমা বেরিয়ে এলেন। তার চোখে বুড়োদের মত একটা চশমা। মাথায় ঘোমটা দেয়া। এটিও আলম লক্ষ্য করেছে–ভদ্রমহিলা মাথায় সব সময় কাপড় দিয়ে রাখেন। হেড মিসট্রেস হেড মিসট্রেস মনে হয় সে কারণেই।

সুরমা বললেন, তোমার কিছু লাগবে?

না, কিছু লাগবে না।

লাগলে বলবে। লাজ করবে না।

জি, আমি বলব।

আমাদের টেলিফোন ঠিক হয়েছে। তুমি যদি কাউকে ফোন করতে চাও বা তোমার বাসায় খবর দিতে চাও দিতে পার।

না, আমার কাউকে খবর দেবার দরকার নেই।

সারাক্ষণ ঐ ঘরটায় বসে থাক কেন? বসার ঘরে এসে বসতে পার। বারান্দায় যেতে পার।

আলম চুপ করে রইল। সুরমা বললেন, তুমি তো কোনো কাপড় জমা নিয়ে আসনি। রাত্রির বাবাকে বলেছি তোমার জন্যে শার্ট নিয়ে আসবে। ও তোমার জন্যে কিছু টাকাও রেখে গেছে। বাইরে-টাইরে যদি যেতে চাও তাহলে রিকশা ভাড়া দেবে।

আমার কাছে টাকা আছে।

তুমি কি কোথাও বেরুবে?

দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করব। দুপুরের মধ্যে যদি কেউ না আসে তাহলে বেরুব।

কারোর কি আসার কথা?

হ্যাঁ।

তুমি যখন না থাক তখন যদি সে আসে তাহলে কি কিছু বলতে হবে?

না, কিছু বলতে হবে না। সে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।

সুরমা ভেতরে চলে গেলেন। আবার সেলাই মেশিনের খটখট শব্দ হতে লাগল। ভদ্রমহিলার মাথা ঠিক নেই বোধহয়। কোন সুস্থ মানুষ দিনরাত একটা মেশিন নিয়ে খটখট করতে পারে না। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। অবশ্যি এখন সময়টাই অস্বাভাবিক। সে জন্যেই বোধ হয় চমৎকার এই সকালটাকে মানাচ্ছে না। দুর্বাঘাসের উপর সুন্দর রোদ। বাতাসে সবুজ ঘাস কাপছে, রোদও কাঁপছে। অস্বাভাবিক এই বন্দি শহরে এটাকে কিছুতেই মানানো

যাচ্ছে না। আলম সিগারেট ধরাল। বিন্তি মেয়েটি নারকেল গাছের নিচে পা ছড়িয়ে বসে আছে। তার মুখ হাসি হাসি। এই মেয়েটি কি সব সময়ই হাসে? এত সুখী কেন সে?

দুপুর তিনটায় আকাশ মেঘলা হয়ে গেল। বাতাস হল আর্দ্র। দুপুরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে বোধ হয়। আলম গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। আকাশের দিকে। মেঘের গতিপ্রকৃতি বোঝার চেষ্টা হয়ত। কতক্ষণে বৃষ্টি নাবমে আঁচ করা। বিন্তি বলল, কই যান?

কাছেই।

পাঁচটার আগে আইবেন কিন্তু। 'কারপু' আছে।

আসব, পাঁচটার আগেই আসব।

পানওয়ালা ইদ্রিস মিয়াও দেখল ছেলেটি মাথা নিচু করে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছে। সেও তাকিয়ে রইল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। রাস্তাঘাটে লোক চলাচল কম। অল্প যে কজন দেখা যায় তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে, দু'একটা কথা বলবার জন্যে মন চায। ইদ্রিস মিয়া কোনো কথা বলল না। সে আজ চোখে সুরমা দিয়েছে সে জন্যে বোধ হয় চোখ কড় কড় করছে। কিংবা হয়ত চোখ উঠবে। চোখ-উঠা রোগ হয়েছে। চায়দিকে সবার চোখ উঠছে।

আলম হাঁটতে হাঁটতে বলাকা সিনেমা হলের সামনে এসে দাঁড়াল। ঢাকা শহরে প্রচুব আর্মির চলাচল বলে যে কথাটা সে শুনেছিল, সেটা ঠিক নয়। আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে সে

একটা মাত্র ট্রাক যেতে দেখেছে। সেই ট্রাকে ছাইরঙা পোশাক পরা একদল মিলিশিয়া বসে আছে। সাধারণত ট্রাকে সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এরা বসে আছে কেন? ক্লান্ত?

চোখে পড়ার মত পরিবর্তন কি কি হয়েছে এই শহরে? আলম ঠিক বুঝতে পারল না। সে সম্ভবত আগে কখনো এ শহরকে ভালভাবে লক্ষ্য করেনি। প্রয়োজন মনে করেনি। এখন কেন জানি ইচ্ছা করছে আগের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে। চারদিকে কেমন যেন পবিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মনে হচ্ছে। পুয়ানো বইপত্রের হকাররা যে জায়গাটা দখল করে থাকত সেটা খালি। একটি অন্ধ ভিখিরী টিনের মগ নিয়ে বসে আছে। একে ছাড়া অন্য কোন ভিখিরী চোখে পড়ে না। সব ভিখিরীকে কি এরা মেরে শেষ করে দিয়েছে? দিয়েছে হয়ত।

রিকশায় কিছু বোরকা পরা মহিলা দেখা গেল। মেয়েরা কি আজকাল বোরকা ছাড়া রাস্তায় নামছে না? কিছু কিছু রিকশায় ছোট ছোট পাকিস্তানি ফ্ল্যাগ। চাঁদ তারা আঁকা এই ফ্ল্যাগের বাজার এখন নিশ্চয়ই জমজমাট। যেখানে-সেখানে এই ফ্ল্যাগ উড়ছে। এর মধ্যে একটি প্রতিযোগিতার ভাবও আছে। কার পতাকাটি কত বড়। লাল রঙের তিনকোণা এক ধরনের পতাকাও দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে কি-সব আরবি লেখা। লেখাগুলি তুলে ফেললেই এটা হয়ে যাবে মে দিবসের পতাকা।

আলম একটা রিকশা নিল। বুড়ো রিকশাওয়ালা। ভারী রিকশা টানতে কষ্ট হচ্ছে, তবু প্যাডেল করছে প্রাণপণে। সায়েন্স ল্যাবরেটরির মোড়ে একটা বরযাত্রীর দল দেখা গেল। নতুন বর বিয়ে করে ফিরছে। বিশাল একটা সাদা গাড়ি মালা দিয়া সাজানো। ট্রাফিক সিগন্যালে আটকে পড়ায় গাড়ি থেমে আছে। আশপাশের সবাই কৌতূহলী হয়ে দেখতে চেষ্টা করছে বর-বউকে। আলমের মনে হল–দেশ যখন স্বাধীন হবে তখন কি এই ছেলেটি

একটু লজ্জিত বোধ করবে না? যখন তার যুদ্ধে যাবার কথা তখন সে গিয়েছে বিয়ে করতে। আজ রাতে সে কি সত্যি সত্যি কোনো ভালবাসার কথা এই মেয়েটিকে বলতে পারবে?

সিগন্যাল পেরিয়ে বরের গাড়ি চলতে শুরু করেছে। বর একটা রুমালে মুখ ঢেকে রেখেছে। বিয়ে হয়ে যাবার পর সাধারণত বররা রুমালে মুখ ঢাকে না। এই ছেলেটি ঢাকছে কেন? সে কি নিজেকে লুকাতে চেষ্টা করছে? দুঃসময়ে বিয়ে করে ফেলায় যে কি খানিকটা লজ্জিত?

জুন মাসে ইয়াদনগরে নদী পার হবার সময় এ রকম একটা বরযাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। দশ-বারো জনের একটা দল। দু'টি নৌকায় বসে আছে। সবার চেহারাই কেমন অস্বাভাবিক। জবুথবু হয়ে বসে আছে। বর ছেলেটি শুটকো মত। তাকে লাগছে উদভ্রান্তের মত। এরা লগীতে নৌকা বেঁধে বসে আছে চুপচাপ। আলমদের দলে ছিল বহমান। সে সব সময়ই বেশি কথা বলে। বরযাত্রী দেখে হাসিমুখে বলল, কি বিয়ে কবতে যান? সাবধানে যাবেন। লঞ্চে করে মিলিটারি চলাচল করছে। ঘনঘন পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলবেন। নওশাকে পাগড়ী পরিয়ে নৌকার গলুইয়ে বসিয়ে রাখলে কেউ কিছু বলবে না। বরযাত্রী দল থেকে কেউ একটি কথাও বলল না। একজন বুড়ো শুধু বিড়বিড় করতে লাগল। বর ছেলেটি কর্কশ গলায় তাকে ধমক দিল চুপ করেন। অত্যন্ত রহস্যময় ব্যাপার।

কিছুক্ষণের মধ্যে জানা গেল, এরা কনে নিযে ফিরছিল। বড় নদী ছেড়ে ছোট নদীতে ঢুকার সময় মিলিটারিদের একটা লঞ্চ এদের থামায়, কনে এবং কনের ছোটবোনকে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়। ছোট বোনটির বয়স এগারো।

আলম বলল, আপনারা কিছুই বললেন না?

কেউ কোনো উত্তর দিল না। রহমান বলল, খামোক এইখানে নৌকা থামিয়ে বসে আছেন কেন? বাড়ি চলে যান। তারপর আবার ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। বাংলাদেশে কি মেয়েব অভাব আছে? অভাব নাই।

লোকগুলি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। যেন কারোর কোন কথাই তাদের মাথায় ঢুকছে না।

আলম ঝিকাতলায় পৌঁছল বিকেল চারটায়। বৃষ্টি পড়ছে টিপটপ কবে। আকাশ মেঘে মেঘে কালো। অন্ধকার হয়ে এসেছে। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাড়ি খুঁজতে হবে। খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা কে জানে। সময় অল্প কার্ফুর আগেই ফিরতে হবে।

বাড়ি খুঁজে পাওয়া গেল সহজেই। ঝিকাতলা ট্যানারির ঠিক সামনে ৩৩ নম্বর বাড়ি। দোতলাদালানের উপরের তালায় থাকেন নজিবুল ইসলাম আখন্দ। কনট্রাক্ট পয়েন্ট।

দোতলায় উঠে আলমের বিস্ময়ের সীমা বইল না। বিশাল এক তালা ঝুলছে বাড়িতে। দরজা জানালা সবই বন্ধ। তালার সাইজ দেখেই মনে হচ্ছে। এ বাড়ির বাসিন্দারা দীর্ঘদিনের জন্যে বাইরে গেছে এবং সম্ভবত আর ফিরবে না।

একতলায় অনেক ধাক্কাধাক্কি করবার পর দরজা একটুখানি খুলল। ভয়ে সাদা হয়ে যাওয়া একটি মেয়ে বলল, কাকে চান?

আখন্দ সাহেবকে। নজিবুল ইসলাম আখন্দ।

উনি দোতলায় থাকেন। এখন নাই।

কোথায় গেছেন?

দেশের বাড়িতে।

ছেলেমেয়ে সবাইকে নিয়ে গেছেন।

হ্যাঁ।

কবে গেছেন।

তিন দিন আগে। উনার ছোট ভাই মারা গেছে দেশের বাড়িতে।

ও আচ্ছা।

মেয়েটি দরজা বন্ধ করে দিল। এ তো একটা সমস্যায় পড়া গেল। আলম। শুকনো মুখে বের হয়ে এল। বাসায় ফিরল হেঁটে হেঁটে। ফোঁটা ফোটা বৃষ্টি। এর মধ্যে হাঁটতে ভালই লাগছে। তার সারাক্ষণই মনে হতে লাগল বাসায় পৌঁছে দেখবে সাদেক বিরক্তমুখে অপেক্ষা করছে। পরদিনই কাজে নেমে পড়া যাবে। কাজকর্ম ছাড়া চুপচাপ বসে থাকাটা আর সহ্য হচ্ছে না।

বারান্দায় উদ্বিগ্ন মুখে মতিন সাহেব দাঁড়িয়ে ছিলেন। আলমকে দেখেই বললেন, কাউকে কিছু না বলে কোথায় গিয়েছিলেন? আমি চিন্তায় অস্থির। একটু পরেই কার্ফু শুরু হয়ে যাবে।

আলম সহজ স্বরে বলল, আমার কাছে কেউ এসেছিল?

না, কেউ আসে নাই। ভিজতে ভিজতে এলে কোত্থেকে? গিয়েছিলে কোথায়?

আলম কোনো জবাব না দিয়ে বসার ঘরে ঢুকে পড়ল। বসার ঘরের সাজসজ্জার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। সোফী একপাশে সরিয়ে একটা ক্যাম্পখাট পাতা হয়েছে। ক্যাম্পখাটে অচিন্তকুমারের প্রথম কদম ফুল। তার মানে শোবার জায়গার বদল হয়েছে। মতিন সাহেব ইতস্তত করে বললেন, আমার মেয়েরা চলে এসেছে। কাজেই তোমাকে বসার ঘরে নিয়ে এলাম। তোমার অসুবিধা হবে না তো?

না, অসুবিধা কিসের?

আমার বড় মেয়ে একটু ইয়ে ধরনের মানে...মতিন সাহেব কথা শেষ করলেন না, মাঝ-পথে থেমে গেলেন। আলম বলল, আমার কোনো অসুবিধা নেই। আপনি চিন্তা করবেন না।

মতিন সাহেব নিচু গলায় বললেন, আলম আরেকটা কথা ইয়ে–মানে আমাদের আরেকটা বাথরুম যে আছে ঐটিতে তুমি যাবে। ঐটা আমি পরিষ্কার করেছি। মানে প্রবলেমটা তোমাকে

আপনাকে প্রবলেম বলতে হবে না। আমার কোনো অসুবিধা নেই।

আলম সিগারেট ধরিয়ে ক্যাম্প খাটে বসল। মতিন সাহেব হা হা করে উঠলেন, ভেজা কাপড়ে বিছানায় বসছ কেন? কাপড় জামা ছাড়া। আমি তোমার জন্য শার্ট আর লুঙ্গি কিনেছি।

থ্যাংক য়্যু।

বারো-তেরো বছরের শান্ত চেহারার একটি মেয়ে উঁকি দিল। এর নামই বোধ হয়। অপালা। মতিন সাহেব বললেন, তোর আপাকে ডেকে আন, পরিচয় করিয়ে দেই।

মেয়েটি ভেতরে চলে গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিবে এসে বলল, আপা আসবে না।

মতিন সাহেব খুব লজ্জায় পড়ে গেলেন। আলম বলল, তোমার নাম অপালা?

হ্যাঁ।

কেমন আছ অপালা?

ভাল।

বস।

না, আমি বসব না।

মেয়েটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এ রকম বাচ্চা মেয়ের চোখ এত তীক্ষ্ণ কেন? এদের চোখ হবে কোমল। আলম সিগারেট ধরাল f মেয়েটি এখনো তাকে মন দিয়ে লক্ষ্য করছে। কেন করছে কে জানে।

অপালা চোখ ফিরিয়ে নিল। শীতল গলায় বলল, আপনি প্রথম কদম ফুল বইটার একটা পাতা ছিঁড়ে ফেলেছেন। বই ছিড়লে আমি খুব রাগ করি।

আর ছিঁড়ব না।
পাতাও মুড়বেন না। এটা আমার খুব প্রিয় বই।

আলম হেসে ফেলল।

রাত্রি সারাদিন খুব গম্ভীর ছিল

রাত্রি সারাদিন খুব গম্ভীর ছিল। সন্ধ্যার পর আরো গম্ভীর হয়ে পড়ল। পৌনে আটটা থেকে আটটা পর্যন্ত বিবিসি বাংলা খবর দেয়। সে খবর শুনবার জন্যেও তার কোন আগ্রহ দেখা গেল না। সবাইকে বলল তার মাথা ধরেছে।

সুরমা অপালাকে জিজ্ঞেস করলেন, ওর কি হয়েছে? অপালা গম্ভীর হয়ে বলল – ফুফুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। সুরমা খুবই অবাক হলেন। রাত্রি কারো সঙ্গে ঝগড়া করার মেয়ে নয়। সে সব কিছুই নিজের মনে চেপে রাখে। সুরমা বললেন, কি নিয়ে ঝগড়া হল?

জানি না কি নিয়ে। ফুফু। ওকে আলাদা ডেকে নিল।

এতক্ষণ এই কথা বলিসনি কেন?

মনে ছিল না।

মনে ছিল না মানে?

আপা আমাকে কিছু বলতে মানা করেছে।

অপালা গল্পের বইয়ে মাথা ডুবিয়ে ফেলল। মার কোন কথাই আসলে তার মাথায় ঢুকছে না। তার বিরক্ত লাগছে। কোন একটা গল্পের বই শুরু করলে অন্য কিছু তার আর ভাল লাগে না। যে গল্পের বইটি সে নিয়ে বসেছে তার নাম আলোর পিপাসা। এই বইটি সে

আগেও বেশ কয়েকবার পড়েছে। প্রতিটি লাইন তার মনে আছে, তবু পড়তে ভাল লাগছে। অপালার বয়স তেরো। রোগা বলে তাকে বয়সের তুলনায় ছোট মনে হয়। এটা তার খুব খারাপ লাগে। তেরো বছর বয়সটা তার পছন্দ নয়। যুদ্ধ শুরু হবার আগে তাদের যে প্রাইভেট মাস্টার ছিল তাকে একদিন সে বলেছেস্যার, আমার বয়স পনেরো। বেশি বয়সে পড়ালেখা শুরু করেছি। তো এই জন্যে ক্লাস এইটি পড়ি। ছোটবেলায় খুব অসুখ-বিসুখে ভুগতাম। পড়াশুনা করতে এই জনেই দেরি হয়ে গেল।

অপালার এ জাতীয় কথাবার্তা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় খুব ঝামেলা হয়েছিল। সুরমা শুধু বকা বকি করেই চুপ থাকেনি, চড় বসিয়ে দিয়েছিলেন। প্রাইভেট মাস্টারটিকে বদলে দিয়ে বুড়ো ধরনের একজন টিচার রাখলেন। এ জাতীয় ঝামেলা অপালা প্রায়ই তৈরি করে। কয়েকদিন আগেই একটা হল। কি-এক উপন্যাস পড়ে তার খুব ভাল লেগেছে। উপন্যাসের নায়িকার নাম মনিকা। সে মনিকা নাম কেটে সমস্ত বইতে নিজের নাম বসিয়েছে। এ নিয়েও মা ঝামেলা করেছেন। তিনি সাধারণত বই-টই পড়েন না। অপালা কেন নায়িকার নামের জায়গায় নিজের নাম বসিয়েছে সেটা জানবার জন্যেই বইটি পড়লেন এবং রাগে তাঁর গা জ্বলে গেল। কারণ উপন্যাসের নায়িকা মনিকা তিনটি ছেলেকে ভালবাসে। ছেলেগুলি সুযোগ পেলেই তাকে জড়িয়ে ধরে। মনিকা কোন বাধা দেয় না। এর মধ্যে একটি ছেলে বেশি রকম সাহসী। সে শুধু গায়ে হাত দিতে চায়। মনিকা তার এই স্বভাব সহ্যই করতে পারে না, তবু তাকেই সে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। ভয়াবহ ব্যাপার।

অপালাকে নিয়ে সুরমার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। তাকে তিনি চোখে চোখে রাখতে চান। নিজে স্কুলে দিয়ে আসেন এবং নিয়ে আসেন। এখন স্কুল বন্ধ বলে এই ঝামেলাটা করতে হচ্ছে না। কিন্তু ওর কোনো টেলিফোন এলে তিনি আড়াল থেকে কথাবার্তা শুনতে চেষ্টা করেন।

রাত্রিকে নিয়ে এ রকম কোনো ঝামেলা হয়নি। রাত্রি যে বড় হয়েছে এটা সে কখনো কাউকে বুঝতেই দেয়নি। একবার শুধু খানিকটা অস্বাভাবিক আচরণ করেছিল। ইউনিভার্সিটিতে সেকেন্ড ইয়ারে যখন পড়ে তখনকার ঘটনা। গরমের ছুটি চলছে। সে সময় সকাল দশটায় এক ছেলে এসে উপস্থিত। সে নাকি রাত্রির সঙ্গে পড়ে। সেলিম নাম। সুরমা অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন রাত্রি কেমন অতিরিক্ত রকমের ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কথাবার্তা বলতে লাগল উঁচু গলায়। শব্দ করে হাসতে লাগল। এবং এক সময় মাকে এসে বলল, মা ওকে আজ দুপুরে খেতে বলি? হলে থাকে, হলের খাবার খুব খারাপ। সুরমা ঠাণ্ডা গলায় বললেন–অজানা-অচেনা ছেলে দুপুর বেলায় এখানে খাবে কেন? ওকে যেতে বল। রাত্রি ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, অচেনা ছেলে নয় তো মা। আমার সঙ্গে পড়ে।

সুরমা শক্ত গলায় বললেন, ক্লাসের ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দেবার জন্যে দুপুর বেলায় বাসায় আসে–এটা আমার পছন্দ নয়। ওকে যেতে বল।

এটা আমি কি করে বলব মা?

যেভাবে বলার সেভাবে বলবি।

রাত্রি চোখ-মুখ লাল করে কথাটা বলতে গেল। এবং বলে এসে সমস্ত দিন কাদল। সুরমা কিছুই বললেন না। কারণ তিনি জানেন এই সাময়িক আবেগ কেটে যাবে। এখানে তাঁকে শক্ত হতেই হবে। ছেলেটিকে তিনি যদি খেতে বলতেন সে বার বার ঘুরে ঘুরে এ বাড়িতে আসত। রাত্রির মত একটি মেয়ের সঙ্গে গল্প করার লোভ সামলানো কঠিন ব্যাপার। মেয়ে

হয়েও সুরমা তা বুঝতে পারেন। বারবার আসা-যাওয়া থেকে একটা ঘনিষ্ঠতা হত। এই বয়সে কাঁচা আবেগের ফল কখনো শুভ হয় না।

সুরমা ভেবে পেলেন না। রাত্রি তার ফুফুর সঙ্গে কি নিয়ে ঝগড়া করবে? তার ফুফুকে সে খুবই পছন্দ করে। তাদের যে সম্পর্ক সেখানে ঝগড়া হবার সুযোগ কোথায়? নাসিমাকে একটা টেলিফোন করা যেতে পারে। কিন্তু তার আগে রাত্রির সঙ্গে কথা বলা দরকার। কিন্তু রাত্রি কী কিছু বলবে? সুরমা অস্বস্তি নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

রাত্রি চুল আঁচড়াচ্ছিল। মাকে দেখে অল্প হাসল। সুরমা মনে মনে ভাবলেন– এই মেয়েটি কি সত্যি আমার? এমন মায়াবতী একটা মেয়ের জন্ম দেবাব মত ভাগ্য আমার কী করে হয়? সুরমা বললেন, আয় চুল বেঁধে দি।

আস্তে করে বাঁধবে মা। তুমি এত শক্ত করে বাঁধ যে মাথাব্যথা করে।

রাত্রি মাথা পেতে দিল। তিনি চিরুনী টানতে টানতে বললেন–নাসিমার সঙ্গে তোর নাকি ঝগড়া হয়েছে?

ঝগড়া হবে কেন?

অপালা বলছিল।

অপালা কত কিছুই বলে।

ঝগড়া হয়নি তাহলে?

না। কি যে তুমি বল মা। আমি কি ঝগড়া করবার মেয়ে?

সুরমা শান্ত গলায় বললেন–তার মানে কি এই যে অন্য কোনো মেয়ে হলে ঝগড়া করত?

রাত্রি হেসে ফেলল, কোনো উত্তর দিল না। সুরমা বললেন, নাসিম তোকে কি বলছিল?

তেমন কিছু না।

সুরমা আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। কারণ তিনি জানেন জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। কোনো জবাব পাওয়া যাবে না। রাত্রি বসে আছে মাথা নিচু করে। মেয়েটি প্রতিদিনই কি সুন্দর হচ্ছে? সুরমার সূক্ষ্ম একটা ব্যথা বোধ হল। রাত্রি মৃদু স্বরে বলল, ঐ ছেলেটি কে মা?

কোন ছেলে?

আমাদের বসার ঘরে যে ছেলেটি আছে?

তোর বাবার দূর-সম্পর্কের ভাগ্নে। আমি ঠিক জানি না।

কথাটা তো মা তুমি মিথ্যা বললে। আমি শুনেছি সে বাবাকে মতিন সাহেব, মতিন সাহেব বলছিল।

সুরমা বাঝাল স্বরে বললেন, আমি জানি না সে কে।

এটাও তো মা ঠিক না। তুমি কিছু না জেনেশুনে একটা ছেলেকে থাকতে দেবে না। তোমাব স্বভাবের মধ্যে এটা নেই।

সুরমা কিছু বললেন না। রাত্রি বলল, আমি কারোর সঙ্গে মিথ্যা কথা বলি না। কেউ যখন আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলে আমার ভাল লাগে না। সুরমা থেমে বললেন, ছেলেটি ঢাকায় গেরিলা অপারেশন চালানোর জন্যে এসেছে। তোর বাবা জুটিয়েছে। বুধবার পর্যন্ত থাকবে। এবা বেশি কিছু আমি জানি না।

রাত্রি কিছু বলল না। এটা একটা বড় ধরনের খবর। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একটা ব্যাপার। কিন্তু রাত্রির কোন ভাবান্তর হল না। সে যে ভাবে বসে ছিল সে ভাবেই বসে বইল।

নাসিমাদের বাসার টেলিফোন লাইনে কোন-একটা গণ্ডগোল আছে। টেলিফোন করলেই অন্য এক বাড়িতে চলে যায়। বুড়োমত এক ভদ্রলোক বলেন, ড. খয়ের সাহেবের বাড়ি। কাকে চান? আজ ভাগ্য ভাল। টেলিফোনে নাসিমাকে পাওয়া গেল। সুরমা বললেন, রাত্রির সঙ্গে তোমাব নাকি ঝগড়া হয়েছে? অপালা বলছিল।

ঝগড়া হয়নি ভাবী। যা বলার আমিই বলেছি। ও শুধু শুনেছে।

কি নিয়ে কথা?

রাত্রির বিয়ের ব্যাপারে। ছেলের মা এসেছিলেন রাত্রির সঙ্গে কথা বলতে। বাত্রি পাথরের মত মুখ করে বসে রইল।

সূচিপত্র

আমাকে তো এসব কিছু বলনি!

বলার মত কিছু হয়নি।

আমার মেয়ের বিয়ে নিয়ে কথাবার্তা বলছি আর আমি কিছু জানিব না?

সময় হলেই জানবে। সময় হোক। ভাবী, রাত্রির জন্যে আমি যে ছেলে আনিব সে ছেলে তোমরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবে না। রাত্রির ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। তোমার তো আরো একটি মেয়ে আছে। ওর বিয়ে তুমি দিও।

নাসিমা।

বল।

এ সময়ে মেয়ের বিয়ে-টিয়ে নিয়ে কথা হোক এটা আমি চাই না। মেয়ের আমি বিয়ে দেব সুসময়ে।

সুসময়ের দেরি আছে ভাবী। ছ'সাত বৎসরের ধাক্কা। তা ছাড়া...

তা ছাড়া কি?

এ রকম সুন্দরী অবিবাহিতা একটি মেয়ে এ সময় কেউ ঘরে রাখছে না। গণ্ডায় গণ্ডায় বিয়ে হচ্ছে রোজ। এইটি নাইনে পড়া মেয়েদেরও বাবা-মা পার করে দিচ্ছে। আমাদের নিচের তলার রফিক সাহেব কি করেছেন শোন...

সুরমা থমথমে গলায় বললেন, রফিক সাহেবের কথা অন্য একদিন শুনব। আজ না। আমার মাথা ধরেছে।

রাত এগারোটা প্রায় বাজে। মতিন সাহেব জেগে আছেন এখনো। রেডিও অস্ট্রেলিয়া শোনা হয়নি। রাত্রিও জেগে আছে। রেডিও অস্ট্রেলিয়া ধরে দেবার দায়িত্ব তার। ফাইন টিউনিং সে খুব ভাল পারে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে গভীর রাতে মতিন সাহেব মেয়ের সঙ্গে মৃদু স্বরে কথা বলতে পছন্দ করেন। কথা একনাগাড়ে তিনিই বলেন। অবিশ্বাস্য আজগুবি গল্প। রাত্রি কোনোটিতেই প্রতিবাদ করে না। হাসিমুখে শুনে যায়।

আজ মতিন সাহেব এক পীর সাহেবের গল্প ফাঁদলেন। পীর সাহেবের বাড়ি যশোহর। তিনি এখন কিছুদিনের জন্য আছেন ঢাকায়। টিক্কা খানের মিলিটারি এডজুটেন্ট নাকি তাকে নিয়ে গিয়েছিল ক্যান্টনমেন্টে। টিক্কা খান খুব বিনীতভাবে পীর সাহেবকে বললেন দোয়া করতে। উত্তরে পীর সাহেব বললেন – তোমাদের সামনে মহাবিপদ। তোমাদের একজনও এই দেশ থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না। এক লাখ। কবর উঠবে বাংলাদেশে।

রাত্রি বলল, তুমি এই গল্প শুনলে কোত্থেকে? মতিন সাহেব বললেন, আমাদের ক্যাশিয়ার সাহেবের কাছে শুনলাম। উনি ঐ পীর সাহেবের মুরিদ। নিজেও খুব সুকী মানুষ। বানানো গল্প বলার লোক না।

মিলিটারি কি আর পীর-ফকিরের কাছে যাবে বাবা?

এমনিতে কি আর যাচ্ছে? ঠেলায় পড়ে যাচ্ছে? ঠেলায় পড়লে বাঘেও ধান খায়! কি রকম লেংগী যে খাচ্ছে তুই এখানে বসে কি বুঝবি। বুঝতে হলে ফ্রন্টে যেতে হবে। তবে দু'একটা দিন অপেক্ষা কর, দেখি কি হয়।

কী হবে?

আজাদহা নেমে গেছে। ঢাকা শহরে। কাকড়া বিছার দল। মিলিটারি কাঁচা খাওয়া শুরু করবে।

গেরিলারা ঢাকায় এসেছে নাকি বাবা?

আসবে না তো কি করবে। মার কোলে বসে থাকবে? ঢাকা ছেয়ে ফেলেছে। দু'একদিনের মধ্যে অপারেশন শুরু হবে। একবার অপারেশন শুরু হলে দেখবি সব কটা জেনারেলের আমাশা হয়ে গেছে। বদনা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে সবাই।

রাত্রি হেসে ফেলল। বাবা এমন ছেলেমানুষি বিশ্বাস নিয়ে কথা বলেন যে বড় মায়া লাগে। মাঝে মাঝে রাত্রি ভাবতে চেষ্টা করে এ দেশে এমন কেউ কি আছে যে এই দেশকে তার বাবার চেয়ে ভালবাসে?

বাবা।

কী?

শুয়ে পড় বাবা। ঘুমাও।

ঘুম ভাল হয় না রে মা। সব সময় একটা আতংকের মধ্যে থাকি।

একদিন এই আতংক কেটে যাবে। আমরা সবাই নিশ্চিন্তে ঘুমুব।

মতিন সাহেবের চোেখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি গলার স্বর অনেকখানি নিচে নামিয়ে বললেন, আমাদের বাসায় যে ছেলেটা আছে সে কে বল তো মা? দেখি তোর কেমন বুদ্ধি।

রাত্রি চুপ করে রইল। মতিন সাহেব ফিসফিস করে বললেন, বলতে পারলি না? জানি পারবি না। ও হচ্ছে সাক্ষাৎ আজাদহা, আবাবিল পক্ষী। ছারখার করে দিবে। কিছু বুঝতে পারলি?

পারছি।

দেখে মনে হয়?

আমার সঙ্গে এখনো দেখা হয়নি।

কথা বলে দেখ, মনে হবে সাধারণ বাঙালি ঘরের ছেলে।

উনি তো বাঙালি ঘরের ছেলেই বাবা।

আরে না। ছেলেতে ছেলেতে ডিফারেন্স আছে না? এরা হচ্ছে সাক্ষাৎ আজাদহা।

আজাদহাটা কি?

মতিন সাহেব জবাব দিতে পারলেন না। আজাদহা কি সে সম্পর্কে তার ধারণা স্পষ্ট নয়। কথাটা তিনি অফিসে শুনেছেন। গেরিলা প্রসঙ্গে কে যেন বলেছিল – তার খুব মনে ধরেছে।

রাত্রি বলল, বাবা, তুমি কি ইনার কথা কাউকে বলেছ?

আরে না। কি সর্বনাশ! কাউকে বলা যায় নাকি?

তুমি তো পেটে কথা রাখতে পার না বাবা। এই তো আমাকে বলে ফেললে।

তিনি চুপ করে গেলেন। রাত্রি বলল, ভাল করে মনে করে দেখ, কাউকে বলনি?

না।

তোমাদের ক্যাশিয়ার সাহেব, তাঁকেও না?

না।

বাবা, ভাল করে ভেবে দেখ। জানাজানি হলে বিরাট বিপদ হবে।

আরে না। তুই পাগল হলি নাকি?

দুধ খাবে বাবা? শোবার আগে এক গ্লাস গরম দুধ খেয়ে শোও। ভাল ঘুম হবে। দুধ না, চা খেতে ইচ্ছা করছে। তোর মাকে না জাগিয়ে এক কাপ চা বানিয়ে দে।

রাত্রি উঠে দাঁড়াল।

আলম হকচাকিয়ে গেল।

প্রায় মাঝরাতে এমন একটি রূপবতী মেয়ে অসংকোচে তার সামনে চায়ের কাপ নামিয়ে রাখবে এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই মেয়েটি রাত্রি, এটা বোঝা যাচ্ছে কিন্তু তার কাণ্ডকারখানা বোঝা যাচ্ছে না। রাত্রি মৃদু স্বরে বলল, বাবার জন্যে চা বানাতে হল। আপনি জেগে আছেন, তাই আপনার জন্যেও বানালাম। ঠিক কি বললে ভাল হয় আলম বুঝতে পারল না। মেয়েটি চলেও যাচ্ছে না। তাকে কী বসতে বলা উচিত? কিন্তু এটা তারই বাড়ি। তার বাড়িতে তাকে বসতে বলার মানে হয় না।

আমি এ বাড়ির বড় মেয়ে। আমার নাম রাত্রি।

আপনি কেমন আছেন?

আপনি কেমন আছেন বলে আলম আরো অস্বস্তিতে পড়ল। বোকার মত একটি প্রশ্ন করা হয়েছে। এবং মেয়েটি তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে। কারণ সে এই প্রশ্নের কোন জবাব দেয়নি। আলমের মনে হল মেয়েটি যেন একটু হাসল।

রাত্রি বলল, আপনি কী আমার ওপর রাগ করেছিলেন?

রাগ করব কেন?

বিকেলে বাবা আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিল তখন আসিনি সে জন্যে।

আরে না। ঐসব নিয়ে আমি ভাবিইনি।

আমার মন খারাপ ছিল তখন, তাই আসিনি। আমার ফুফুর ওপর রাগ করেছিলাম।

ও আচ্ছা।

আপনি বোধ হয় চা-টা খাবেন না। দিন নিয়ে যাই।

না। আমি খাব।

আলম চায়ে চুমুক দিল। রাত্রি বলল–কিছু বলবেন না?

কি বলব?

ভদ্রতা করে কিছু বলা। যেমন চা-টা খুব ভাল হয়েছে এ জাতীয়।

রাত্রি হাসছে। আলম ধাঁধায় পড়ে গেল। এই বয়েসী মেয়েদের সঙ্গে তার কথা বলার অভ্যেস নেই। খুবই অস্বস্তি লাগছে। সে বুঝতে পারছে তার গাল এবং কান লাল হতে

শুরু করেছে। ইচ্ছে করছে এ জায়গা থেকে কোনোমতে ছুটে পালিয়ে যেতে এবং একই সঙ্গে মনে হচ্ছে এই মেয়েটি এক্ষুণি যেন চলে না যায়। যেন সে থাকে আরো কিছুক্ষণ। আলমের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল।

রাত্রি বলল, যাই। আপনি শুয়ে পড়ুন।

আলম অনেক রাত পর্যন্ত চুপচাপ বসে রইল। অদ্ভুত এক ধরনের কষ্ট হতে লাগল তার। এই কষ্টের জন্ম কোথায় তার জানা নেই।

রাত বাড়ছে। চারদিক চুপচাপ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আবারো হয়ত ঝড়-বৃষ্টি হবে। হোক, খুব হোক। সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাক।

আলম বাতি নিভিয়ে দিল। আজ রাতেও ঘুম আসবে না। জেগে কাটাতে হবে। ঢাকায় আসার পর থেকে এমন হচ্ছে। কেন হচ্ছে? আগে তো কখনো হয়নি। সে কি ভয় পাচ্ছে? ভালবাসা, ভয়, ঘৃণা, এসব জিনিসের জন্ম কোথায়?

তার পানির পিপাসা হল। কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছে না।

শরীফ সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন

শরীফ সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। নিজের চোখকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। আলম বলল, কথা বলছি না কেন মামা? কেমন আছ?

ভাল আছি। তুই কোথেকে। বেঁচে আছিস এখনো?

আছি। বাসা অন্ধকার কেন? মামি কোথায়?

দেশের বাড়িতে। তুই এখন কোনো প্রশ্ন কববি না। কিছুক্ষণ সময় দে নিজেকে সামলাই।

শরীফ সাহেব সোফায় বসে সত্যি সত্যি বড় নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন। আলম বলল, বাসার খবর বল। সবাই আছে কেমন?

তুই বাসায় যাসনি?

না।

সরাসরি আমার এখানে এসেছিস?

তাও না। ঢাকাতেই আছি কয়েকদিন ধরে।

তোর কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

ঢাকায় আমি একটা কাজ নিয়ে এসেছি মামা।

আই সি।

এখন বল বাসার খবর।

বাসার খবর তোকে কেন বলব? তোর কী কোন আগ্রহ আছে, না কোন দায়িত্বজ্ঞান আছে? বোন আর মাকে ফেলে চলে গেলি দেশ উদ্ধারে। ওদের কথা ভাবলি না?

তোমরা আছে, তোমরা ভাববে।

প্রথম রেসপনসিবিলিটি হচ্ছে নিজের পরিবারের জন্যে। এই সাধারণ কথাটা তোরা কবে বুঝবি?

আলম হেসে ফেলল। শরীফ সাহেব রেগে গেলেন। মানুষটি ছোটখাটো। ফাইন্যান্সের জয়েন্ট সেক্রেটারি। যতটা না বয়েস তার বেয়েও বুড়ো দেখাচ্ছে। মাথার সমস্ত চুল পেকে গেছে। মুখের চামড়ায় ভাজ পড়েছে। আলম বলল মামা, বাসার খবর তো এখনো দিলে না। ওরা কেমন আছে?

ভালই।

মা'র শরীর কেমন?

শরীর ঠিকই আছে। শরীর একটা আশ্চর্য জিনিস, এটা ঠিকই থাকে।

তোমার তো তাও ঠিক নেই মামা, বুড়ো হয়ে গেছ।

তা হয়েছি। একা থাকি। রাতে ঘুম-টুম হয় না।

আমাদের বাড়িতে গিয়ে থাকলেই পাের।

পাগল হয়েছিস। ঐ বাড়ির ওপর নজর রাখছে না। তুই যুদ্ধে গেছিস সবাই জানে। তোর মাকে থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

আর কোনো ঝামেলা করেনি?

করত। তোর বাবার জন্যে বেঁচে গেলি! ভাগ্যিস সে মরবার আগে ‘তমঘায়ে খিদমত’টা পেয়েছিল।

শরীফ সাহেব শার্ট গায়ে দিলেন। জুতো পরলেন।

যাচ্ছে কোথায় মামা?

অফিসে। আর কোথায় যাব? তুই কি ভেবেছিলি – যুদ্ধে যাচ্ছি?

অফিস-টফিস করছি ঠিকমতই?

করব না? তোর মত কয়েকজন চেংড়া ছোড়া দু'একটা গুলি-টুলি করবে। আর এতেই দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে? দিল্লি হনুজ দূরঅস্ত। তাছাড়া পলিটিক্যাল সলুশন হয়ে যাচ্ছে। খুব হাই লেভেলে কথাবার্তা হচ্ছে। আমেরিকা চাপ দিচ্ছে। আমেরিকার চাপ কি জিনিস তোরা বুঝবি না। স্যাকরার ঠিকঠাক কামারের এক ঘা।

আলম হাসতে লাগল। এই মামার সঙ্গে তার খুবই ভাব। একজন সৎ এবং সত্যিকার অর্থে ভাল মানুষ। তাঁর একটি মাত্র দোষ–উল্টো তর্ক করা। আলমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু এই তিনিই আবার পাকিস্তানি ভাব আছে এমন কারোর সঙ্গে কথা বলবার সময় এমন যুক্তি দেবেন যাতে মনে হবে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে দেশ স্বাধীন হচ্ছে।

আলম।

জি।

তোর মার সঙ্গে দেখা করবি না?

না।

ভাল। লায়েক ছেলে তুই! যা ভাল মনে করিস তাই করবি। আমার এখানে থাকতে চাস?

না।

তোর কি ধারণা আমার এখানে উঠলেই তোকে আমি মিলিটারির হাতে ধরিয়ে দেব?

তোমাদের কোনো ঝামেলায় ফেলতে চাই না।

এসেছিস কী জন্যে আমার কাছে?

দেখতে এলাম।

যা দেখার ভাল করে দেখে নে। দশ মিনিট সময়। দশ মিনিটের মধ্যেই বেরুব।

আলম উঠে দাঁড়াল। শরীফ সাহেব বললেন, তুই কোথায় আছিস ঠিকানাটা রেখে যা।

ঠিকানা দেয়া যাবে না মামা। মাকে বুলবে। আমি ভাল আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব।

আমি বললে বিশ্বাস করবে না। তুই মরে গেছিস এটা বললে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করবে, বেঁচে আছিস বললে করবে না। তুই একটা কাজ কর, একটা কাগজে লেখ–আমি ভাল আছি। তারপর নাম সই করে দে। আজকের তারিখ দিবি।

আলম লিখল–ভাল আছি মা। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে লিখল, শিগগির তোমাকে দেখতে আসব। দ্বিতীয় লাইনটি লিখে তার একটু খারাপ লাগতে লাগল। শিগগিরই তোমাকে দেখতে আসব। এই লাইনটিতে কোথায় যেন একটু বিষাদের ভাব আছে। দেখতে আসা হবে না। এই কথাটি যেন এর মধ্যে লুকানো।

শরীফ সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, একটা লাইন লিখতে গিয়ে বুড়ো হয়ে যাচ্ছিস দেখি। তাড়াতাড়ি কর।

আলম কাগজটা মামার হাতে ধরিয়ে নিউ পল্টনে চলে এল। বসবার ঘরে সাদেক তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

সাদেককে কেমন অচেনা লাগছে।

ফর্সা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একজন মানুষ। সে গোঁফ ফেলে দিয়েছে। লম্বা চুল ছিল। সেগুলি কেটেছে। জুতো জোড়াও চক চক করছে। আলম বলল, খোলস পাল্টে ফেলেছিস মনে হচ্ছে। চেনা যাচ্ছে না।

ঢাকা শহরে ঢুকলাম এতদিন পর। সেজোগুজে ঢুকব না? তুই ছিলি কোথায়? দেড় ঘণ্টা ধরে এক জায়গায় বসে আছি।

আজ আসবি বুঝব কী করে? আমি তো ভাবলাম প্রোগ্রাম ক্যানসেল। সব বাতিল।

ক্যানসোল হওয়ার মতই।

কী বললি?

রহমানের খোঁজ নেই। নো ট্রেস।

নো ট্রেস মানে?

নো ট্রেস মানে নো ট্রেস। সে আমার সঙ্গেই ঢাকায় ঢুকেছে। তারপর যেখানে যাবাব কথা সেখাদ্যযন্ধু, কোথায় আছে তাও কেউ জানে না। একগাদা এক্সপ্লোসিভ তার সাথে।

বলিস কী?

আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছিল। ডুব মারলাম। তিনদিন ডুব দিয়ে থাকার পর গেলাম ঝিকাতলা। কনটাক্ট পয়েন্টে। সেখানেও ভোঁ ভোঁ। কেউ নেই।

এখন ব্যাপারটা কোন পর্যায়ে আছে?

বলছি। তার আগে বাথরুমে যাওয়া দরকার। কিডনি ফেটে যাওয়ার মতো অবস্থা। হেভি প্রেসার।

আলম ইতস্তত করে বলল, এখানে বাথরুমের একটু অসুবিধা আছে। বাইরে চলে যা, রাস্তার পাশে কোথাও বসে পড়। সাদেক বেরিয়ে গেল। এ বাড়িতে এসে সে খানিকটা ধাঁধায় পড়ে গেছে। দেড় ঘণ্টা একা একাই বসে ছিল। এর মধ্যে ঘোমটা দেয়া এক মহিলা এসে বললেন, আলম বাইরে গেছে। এসে পড়বে। তুমি বস। এ রকম শীতল কণ্ঠ সাদেক এর আগে শোনেনি। যেন একজন মরা মানুষ কথা বলছে।

প্রায় আধঘণ্টা পর বাইশ-তেইশ বছর বয়েসী চকলেট রঙ শাড়ি পরা একটি মেয়ে এসে ঢুকল এবং সরু চোখে তাকিয়ে রইল। এ রকম রূপবতী মেয়েদের সাধারণত সিনেমা পত্রিকার কভারে দেখা যায়। বাড়িতে তাদের দেখতে পাওয়ার কথা নয়। সাদেক ঘাবড়ে

গিয়ে বলল, কিছু বলবেন আমাকে? মেয়েটি তার মার মত শীতল গলায় বলল, আপনি কী দুপুরে এখানে খাবেন?

কি অদ্ভুত কথা। অচেনা, অজানা একটা মানুষকে কেউ এভাবে বলে নাকি? সাদেক অবশ্যি নিজেকে চট করে সামলে নিয়ে বলল, জি খাব। দুপুরে কী রান্না হচ্ছে?

মেয়েটি এই কথার জবাব দেয়নি। ভেতরে চলে গেছে। তারপর খাটাং খটাং শব্দ। সেলাই মেশিন চলতে শুরু করেছে। মেয়েটি চায়ের কাপ নিয়ে এসেছে কিছুক্ষণ পর। কাপ নামিয়ে বলেছে। চিনি লাগবে কিনা বলুন।

না লাগবে না।

চুমুক দিয়ে বলুন। চুমুক না দিয়েই কিভাবে বললেন?

সাদেক চুমুক দিয়েছে। তার বাথরুমে যাওয়া দরকার ছিল। কিন্তু এ রকম রূপবতী একটি মেয়েকে নিশ্চয়ই বলা যায় না। আমি একটু ইয়েতে যাব। সাদেক বসে বসে তেতাল্লিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রথম কদম ফুল পড়ে ফেলল। বইটা থাকায় রক্ষা। নয়ত সময় কাটানো মুশকিল হত। ফেরার সময় বইটা সঙ্গে করে নিতে হবে। কোনো কাজ আধাআধি করে রাখা ঠিক না। মরে গেলে একটা আফসোস থাকবে।

সাদেক অল্প কথায় কিছু বলতে পারে না। কিংবা বলার চেষ্টাও করে না। রহমানের খোঁজ পাওয়া গেছে। সে ভালই আছে–এই খবরটা বেবি করতে অ্যালমের এক ঘণ্টা লাগল।

তাও পুরোপুরি বের করা গেল না। কেন রহমান যেখানে উঠার কথা ছিল সেখানে উঠেনি। সেটা জানা গেল না।

জিনিসপত্র সব এসেছে?

এসেছে কিছু কিছু।

কিছু কিছু মানে কী?

কিছু কিছু মানে হচ্ছে কিছু কিছু।

আলম বিরক্ত হয়ে বলল, যা বলার পরিষ্কার করে বল। অর্ধেক কথা পেটে রেখে দিচ্ছিস কেন? কী কী জিনিসপত্র এসেছে?

যা যা দরকার সবই এসেছে। শুধু এলএমজি আসেনি।

আসেনি কেন?

আমাকে বলছিস কেন? আর এ রকম ধমক দিয়ে কথা বলছিস কেন? জিনিসপত্র আনার দায়িত্ব আমার ছিল না। এক্সপ্লোসিভ আনার কথা ছিল, নিয়ে এসেছি।

কোথায় সেগুলি?

জায়গামতই আছে।

প্রোগ্রামটা কী?

সাদেক সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, সেটা তুই ঠিক করা। তুই হচ্ছিস লিডার। তুই যা বলবি, তাই।

সবার সঙ্গে কথা বলা দরকার।

কারো সঙ্গে কথা বলার দরকার নেই। ফাইন্যাল প্রোগ্রামটা শুধু ওদের জানাব। সেই ভাবে কাজ হবে। প্রথম দানেই ছক্কা ফেলতে হবে।

ছক্কা ফেলতে হবে মানে?

সাদেক বিরক্ত হয়ে বলল, তুই কী বাংলাও ভুলে গেছিস? ছক্কা পাঞ্জাও তোর কাছে এক্সপ্লেইন করতে হবে? প্রথম দানে ছক্কা মানে প্রথম অপারেশন হবে ক্লাস ওয়ান। ওয়ান হানড্রেড পারসেন্ট সাকসেস। বুঝতে পারছিস?

আলম চুপ করে রইল। সাদক সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, তুই কেমন অন্য রকম হয়ে গেছিস!

কী রকম?

কেমন যেন সুখী সুখী চেহারা হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে তুই এ বাড়ির জমাই। সাদেক গলা ফাটিয়া হাসতে লাগল। অস্বস্তিকর অবস্থা। আলম বিরক্তমুখে বলল, এত হাসছিস কেন? হাসির কী হয়েছে?

তুই কেমন পুতুপুতু হয়ে গেছিল তাই দেখে হাসি আসছে। মোনালিসার প্রেমে পড়ে গেছিল

চুপ কর।

ভাবভঙ্গি তো সে রকমই। মজনু মজনু ভাব। অবশ্যি যে জিনিস দেখলাম প্রেমে পড়াই উচিত।

সাদেককে আটকানো মুশকিল। যা মনে আসবে বলবে। আলম চিন্তায় পড়ে গেল। সে গম্ভীর গলায় বলল, আজেবাজে কথা বন্ধ করা। কাজের কথা বল। মোটামুটি একটা প্ল্যান দাঁড় করানো যাক। আমরা বেরুব কখন?

কার্ফুর আগে আগে বের হওয়াই ভাল। রাস্তাঘাটে লোক চলাচল সে সময়টায় বেশি থাকে। গাড়ি-টাড়ি চলে। সময়টা ধর সাড়ে তিন থেকে চার।

কথাবার্তার এই পর্যায়ে বিন্তি এসে বলল, আপনেরো খাইতে ডাকে। আহেন।

খাবার টেবিল বারান্দায়। খাবার দেয়া হয়েছে দু'জনকেই। এ বাড়ির কেউ বসেনি। সুরমা দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠাণ্ডা, গলায় বললেন, নিজেরা নিয়ে খাও। সাদেক সঙ্গে সঙ্গে বলল,

কোনো অসুবিধা নেই খালাম্মা। আপনার থাকতে হবে না। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমার কোনো লজ্জা নেই।

লজা না থাকাই ভাল।

আমার কোনো কিছুতেই লজ্জা নেই। আলমের সঙ্গে আমার বনে না। এই জন্যেই। কয়েকটা শুকনো মরিচ ভেজে আনতে বলুন তো খালাম্মা। ঝাল কম হয়েছে।

সুরমা নিজেই গেলেন। সাদেক মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে দেখতে লাগল। মৃদু স্বরে বলল, বেশি পরিষ্কার। ভাগ্যিস এ বাড়িতে আমি উঠিনি। আমার এখানে উঠার কথা ছিল। বাড়ির মালিক কী করেন?

জানি না। কী করেন?

বলিস কী, ভদ্রলোক কি করেন জানিস না?

না।

মেয়েটার নাম কী? না তাও জানিস না?

ওর নাম রাত্রি।

রাত্রি? বাহ, চমৎকার তো! জোছনা রাত্রি নিশ্চয়ই। হা হা হা।

আস্তে হাস।

সুরমা কাচের প্লেটে ভাজা শুকনা মরিচ নিয়ে ঢুকতেই সাদেক বলল, রাত্রি খাবে না? হোস্টদের তরফ থেকে কারোর বসা উচিত। সুরমা শান্ত স্বরে বললেন, তোমরা খাও, ওরা পরে খাবে।

পরে খাবে কেন? ডাকুন, গল্প করতে করতে খাই।

সুরমা অনেকক্ষণ সাদেকের দিকে তাকিয়ে থেকে সত্যি সত্যি রাত্রিকে ডাকলেন। এবং আশ্চর্য! রাত্রি একটি কথা না বলে খেতে বসল। সাদেক হাত-টাত নেড়ে একটা হাসির গল্প শুরু করল। ছেলেবেলায় দৈ মনে করে এক খাবলা চুন খেয়ে তার কী দশা হয়েছিল। দশ দিন মুখ বন্ধ করতে পারেনি। হা করে থাকতে হত। সেই থেকে তার নাম হয়ে গেল ভেটকি মাছ। ভেটকি মাছ মুখ বন্ধ করে না, হা করে থাকে। গল্প শুনে কেউ হাসল না। সাদেক একাই বারান্দা কাঁপিয়ে হাসতে লাগল।

ফার্স্ট ক্লাস রান্না হয়েছে খালাম্মা। খাওয়ার পর আমি পান খাব। পান আছে ঘরে? না থাকলে বিন্তিকে পাঠিয়ে দিন, নিয়ে আসবে।

সুরমা বিন্তিকে পান আনতে পাঠালেন। সাদেক রাত্রির দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, আপনি এত গম্ভীর হয়ে আছেন কেন? রাত্রি কিছু বলল না।

আপনি ইউনিভার্সিটিতে পড়েন নিশ্চয়ই। চেহারা দেখেই মনে হচ্ছে। ইউনিভার্সিটিতে পড়া মেয়েগুলি গম্ভীর হয় খুব।

আমি ইউনিভার্সিটিতেই পড়ি।

কোন সাবজেক্ট?

কেমিস্ট্রি।

সর্বনাশ! মেয়েরা এত কঠিন কঠিন সাবজেক্ট কেন পড়ে বুঝতে পারি না। মেয়েরা পড়বে বাংলা।

রাত্রি উঠে পড়ল। আলম একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করল। রাত্রি মেয়েটি বিরক্ত হয়নি। সাদেকের কথাবার্তার ধরনে যে-কেউ বিরক্ত হত। হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই মেয়েটি হয়নি। হাত ধুয়ে এসে সে আবার চেয়ারে বসল এবং চামচে করে ভাত তুলে দিল সাদেকের প্লেটে। তুলে দেয়ার ভঙ্গিটা সহজ ও স্বাভাবিক।

সাদেক দুপুর তিনটা পর্যন্ত থাকল। মৃদু গলায় প্ল্যান নিয়ে কথা বলল। প্রথম দিনের অপারেশনের জায়গাগুলি ঠিক করল। রেকি করবার কি ব্যবস্থা করা যায় সে নিয়ে কথা বলল। অপারেশন চালাতে হবে অচেনা গাড়ি দিয়ে। সেই গাড়ির জোগাড় কিভাবে করা যায়। সেই নিয়েও কথা হল। আগামীকাল ভোরে আবার বসতে হবে। এ বাড়িতে নয়। পাক মটরস-এর কাছের একটি বাড়িতে। সেখানে রহমানও থাকবে। প্রোগ্রাম ফাইন্যাল করা হবে সেখানেই।

সাদেক যাবার আগে সুরমাকে পা ছুঁয়ে সালাম করল। সুরমা হকচাকিয়ে গেলেন।

দোয়া করবেন খালাম্মা।

হ্যাঁ নিশ্চয়ই দোয়া করব।

রাত্রিকে ডাকুন। ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাই।

রাত্রি এল। খুব সহজ এবং স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সাদেক বলল, রাত্রি চলি। আবার দেখা হবে। যেন এ বাড়ির সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের চেনাজানা। রোজই আসছে, যাচ্ছে। রাত্রি হেসে ফেলে বলল, হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেখা হবে। ভাল থাকবেন।

সাদেক ঘর থেকে বেরুবামাত্র রাত্রি বলল, আপনার বন্ধুর সঙ্গে আপনার কোন মিল নেই। দু'জন সম্পূর্ণ দুরকম। ও কী আপনার খুব ভাল বন্ধু?

হ্যাঁ ভাল বন্ধু। ও কিন্তু একটি অসম্ভব ভাল ছেলে।

তা জানি।

কিভাবে জানেন?

কিছু কিছু জিনিস টের পাওয়া যায়। আপনার হয়ত ধারণা হয়েছে। আমি উনার ওপর বিরক্ত হয়েছি। এটা ঠিক না। আমি বিরক্ত হইনি।

অনেক দিন পর আলম দুপুর বেলা ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যা মিলাবার পর। বিন্তি চায়ের পেয়ালা হাতে তাকে ডাকছে। বাইরে প্রবল বর্ষণ। ঘোর বর্ষা যাকে বল। মতিন

সাহেব বসে আছেন সোফায়। তাকে কেমন যেন চিন্তিত মনে হচ্ছে। আলম উঠে বসতেই তিনি বললেন, শরীর খারাপ করেছে নাকি?

জি না।

হাত-মুখ ধুয়ে আস। একটা খারাপ খবর আছে।

কী সেটা?

আমেরিকানরা সেভেনথ ফ্লিট নিয়ে বঙ্গোপসাগরের দিকে রওনা হয়েছে।

আলম এই খবরে তেমন কোনো উৎসাহ দেখাল না। তার কাজকর্মের সঙ্গে আমেরিকান সেভেনথ ফ্লিটের কোন সম্পর্ক নেই। মতিন সাহেব নিচু গলায় বললেন, এর চেয়েও একটা খারাপ সংবাদ আছে।

বলুন শুনি।

ঢাকা শহরে চাইনিজি সোলজার দেখা গেছে।

আপনি নিজে দেখেছেন?

না, আমি নিজে দেখিনি। কিন্তু দেখেছেন অনেকেই। নাক চেঁপা বাঁটু সোলজার। দেখলেই চেনা যায়।

আলম বাসিমুখে চায়ে চুমুক দিতে লাগল। গুজবে ভর্তি হয়ে গেছে। ঢাকা শহর। মানুষের মরাল ভেঙে পড়ছে। ঢাকা শহরের গেরিলাদের প্রথম কাজই হবে এই মরাল ঠিক করা। নতুন ধরনের গুজবের জন্ম দেয়া। যা শুনে একেকজনেব বুকেব ছাতি ফুলে উঠবে। এবা রাতে আশা নিয়ে ঘুমুতে যাবে। মতিন সাহেবের মত প্রাণহীন মুখ করে সোফায় বসে থাকবে না।

আলম।

বলুন।

শুনলাম তোমার এক বন্ধু নাকি এসেছিল?

জি।

কাজ তাহলে শুরু হচ্ছে?

হচ্ছে।

অবস্থা কাহিল হয়ে যাবে ওদের, কী বল?

তা হবে।

এক লাখ নতুন কবর হবে, কী বল? :

হওয়ার তো কথা।

যশোহরের এক পীর সাহেব কী বলেছেন শুনবে কী?

বলুন।

খুবই কামেল আদমি। সুফী মানুষ।

মতিন সাহেব অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে যশোবের পীর সাহেবের কথা বলতে লাগলেন। আলম কোনো কথা না বলে গল্প শুনে গেল। ডুবন্ত মানুষরাই খড়কুটো আঁকড়ে ধরে। ঢাকার মানুষ কী ডুবন্ত মানুষ? তারা কেন এ রকম করবে? আলম একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস চাপতে চেষ্টা করল।

রাত্রির ঘর অন্ধকার। সে বাতি নিভিয়ে চুপচাপ শুয়েছিল। অপালা এসে বলল, ফুফু টেলিফোন করেছে। তোমাকে ডাকে। রাত্রি একবার ভাবল টেলিফোন ধরবে না। বলে পাঠাবে শবীর ভাল না, জ্বরজ্বর লাগছে। কিন্তু তাতে লাভ হবে না। ফুফু বলবেন রিসিভার এ ঘরে নিয়ে আসতে। তার চেয়ে টেলিফোন ধরাই ভাল।

কেমন আছিস রাত্রি?

ভাল।

তোদের ইউনিভার্সিটি নাকি খুলেছে? ক্লাস-টাস হচ্ছে?

হ্যাঁ হচ্ছে।

তুই যাচ্ছিস না?

না। পরীক্ষা নাকি ঠিকমত হবে শুনলাম?

হলে হবে।

তোর গলাটা এত ভারী ভারী লাগছে কেন? জ্বর নাকি?

না, জ্বর না।

কাল গাড়ি পাঠাব। চলে আসবি আমার এখানে।

আচ্ছা।

আরেকটা কথা শোন, ঐ ভদ্রমহিলা আসবেন তোকে দেখতে। দেখলেই যে বিয়ে হবে এমন তো কোনো কথা না। তোর মত মেয়েকে কি কেউ জোর করে বিয়ে দিতে পারে? তোর অনিচ্ছায় কিছু হবে না। বুঝতে পারছিস?

পারছি।

কাজেই ভদ্রমহিলা এলে স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলবি।

ঠিক আছে বলব।

রাত্রি আরেকটা কথা শোন–আমাদের ড্রাইভার বলল সে দেখেছে কে একজন লোক তোদের বসার ঘরের ক্যাম্প খাটে শুয়ে আছে। কে সে?

আব্বার এক বন্ধুর ছেলে।

এখানে সে কী করছে?

কি একটা কাজে ঢাকায় এসেছে। থাকার জায়গা নেই। বুধবারে চলে যাবে।

নাসিমা বিরক্ত স্বরে বললেন– থাকার জায়গা নেই মানে? হোটেল আছে কী জন্যে? বাড়িতে সেয়ানা মেয়ে। এর মধ্যে ছেলে-ছোকরা এনে ঢুকানোর মানেটা কী? দেখি তোর বাবাকে টেলিফোনটা দে তো।

মতিন সাহেব টেলিফোনটা ধরতে রাজি হলেন না। কারণ তিনি বিবিসি শুনছেন। এই অবস্থায় তাকে হাতী দিয়ে টেনেও কোথাও নেয়া যাবে না। বিবিসি একটা বেশ মজার খবর দিল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আমেরিকান টিভি এনবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন– আলোচনার দ্বার রুদ্ধ নয়। এর মানে কী? কী আলোচনা? কার সঙ্গে আলোচনা? হাতী কী কাদায় পড়ে গেছে নাকি? এটেল মাটির কাদা। মতিন সাহেব অনেক দিন পর ঢাকা রেডিও খুললেন। মাঝে-মধ্যে এদের কথাও শোনা দরকার। তেমন কোনো খবর নেই। দেশে সার্বিক পরিস্থিতির উন্নয়নের কারণে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন শান্তি ও কল্যাণ কমিটির সভাপতি ফরিদ আহমেদ। মুসলিম লীগের সভাপতি হাশিমউদ্দীনের বিবৃতিও খুব ফলাও

কবে প্রচার করা হল – ছাত্র-ছাত্রীরা যেন দেশদ্রোহীদের দুরভিসন্ধিমূলক ও মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত না হয়। তারা যেন একটি মূল্যবান শিক্ষাবছর নষ্ট না করে। শান্তিপূর্ণভাবে মেট্রিক পরীক্ষা পরিচালনার জন্যে সরকার যা করণীয় সবই করবেন।

পনেরই জুলাই থেকে মেট্রিক পরীক্ষা। ঐ দিন একটা শো-ডাউন হবে বলে মতিন সাহেবের ধারণা। মুক্তিবাহিনীর আজাদহারা নিশ্চয়ই পরীক্ষা বানচাল করবার কাজে নামবে। ঐ দিন একটা উলট পালট হয়ে যাবে। এটা চোখ বন্ধ করে বলে দেয়া যায়। মতিন সাহেব তার রক্তের ভেতরে এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করলেন।

সুরমা রাতের খাবারের আয়োজন করছিলেন। তাঁর মুখ বিষন্ন। কোনো কারণে তিনি খুবই বিচলিত। কারণটি কি নিজেও স্পষ্ট জানেন না। মাঝে মাঝে তার এ রকম হয়। বাত্রি এসে মার পাশে দাঁড়াল। সুরমা বললেন, কিছু বলবি?

হ্যাঁ মা, উনাকে ভেতরের ঘরে থাকতে দেয়া উচিত।

আলমের কথা বলছিস?

হ্যাঁ। বসার ঘরে থাকলেই সবার চোখে পড়বে। ফুফু, টেলিফোনে জিজ্ঞেস করছিলেন। তাঁদের ড্রাইভার দেখে গেছে।

এখন আবার ভেতরের ঘরে নিয়ে গেলে সেটা কী আরা বেশি করে চোখে পড়বে না?

রাত্রি কিছু বলতে পারল না। বেশির ভাগ সময়ই সুরমা চমৎকার মুক্তি দিয়ে কথা বলেন।

রাত্রি।

বল মা।

ভেতরে নেয়ার আরেকটি সমস্যা কী জানিস? ছেলেটি অস্বস্তি বোধ করবে। একবার ভেতরে নেয়া হচ্ছে একবার বাইরে। আবার ভেতরে। আমি কী ঠিক বলছি। রাত্রি?

ঠিকই বলছি।

সুরমা অস্পষ্টভাবে হাসলেন। মৃদু স্বরে বললেন, তোর যখন ইচ্ছা তাকে ভেতরেই নিয়ে আয়। বিন্তিকে বল ঘর পরিষ্কার করতে। অপালা কী করছে? তাকে তো কোনো কাজেই পাওয়া যায় না। মুখের সামনে গল্পের বই ধরে বসে আছে। ওকেও লাগিয়ে দে।

রাত্রি কাউকে লাগাল না, নিজেই পরিষ্কার করতে লাগল। সুরমা এক সময় উঁকি দিলেন। চমৎকার সাজানো হয়েছে। জানালায় পর্দা দেয়া হয়েছে। একটা ছোট্ট বুক সেলফ আনা হয়েছে। বুক সেলফ ভর্তি বই। অপালার পড়ার টেবিলটিও আনা হয়েছে। ঘরে। টেবিলে চমৎকার টেবিল ক্লথ। পিরিচ দিয়ে ঢাকা পানির জগ এবং গ্লাস। সুরমা বিস্মিত হয়ে বললেন, ব্যাপার কী রাত্রি? রাত্রি লজ্জা পেয়ে গেল। তার গাল ঈষৎ লাল হয়ে গেল। এই ক্ষুদ্র পরিবর্তনও সুরমাব চোখ এড়িয়ে গেল না। তিনি হালকা স্বরে বললেন, ছেলেটা হঠাৎ এই পরিবর্তন দেখে কী ভাববে বলত?

কিছুই ভাববেন না। উনি অন্য ব্যাপারে ডুবে আছেন। কিছুই তাঁর চোখে পড়বে না। উনি আছেন একটা ঘোরের মধ্যে।

তুই যা করেছিস চোখে না পড়ে উপায় আছে?

আলমের কিছু চোখে পড়ল বলে মনে হল না। সে সহজভাবেই ভেতরের ঘরে চলে এল। প্রথম কদম ফুল-এর পাতা উল্টাতে লাগল। রাত্রি দাবজাব পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে হাসিমুখে বলল–বইটা কেমন লাগছে?

ভাল।

ছেলেটার ওপর আপনার রাগ লাগছে না?

কোন ছেলেটার ওপর?

কাকলীর হাজবেন্ড।

না, রাগ লাগবে কেন?

আপনার কী আর কিছু লাগবে?

না, কিছু লাগবে না।

ড্রয়ারে মোমবাতি আছে। যদি বাতি নিভে যায় মোমবাতি জ্বালাবেন।

ঠিক আছে, জ্বালাব।

রাত দশটায় মতিন সাহেব আলমকে ডাকতে এলেন ভয়েস অব আমেরিকা শুনবার জন্যে। আলম বলল তার মাথা ধরেছে, সে শুয়ে থাকবে। মতিন সাহেব তাঁবু খানিকক্ষণ ঝুলাঝুলি করলেন। একা একা তার কিছু শুনতে ইচ্ছা করে না। আজ রাত্রিও নেই। দবাজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে।

মতিন সাহেব শোবার ঘরে ঢুকলেন। সুষমা জেগে আছে এখনো। আলনায় কাপড় রাখছে। মতিন সাহেব ভয়ে ভয়ে বললেন, সুরমা ভয়েস অব আমেরিকা শুনবে? সুরমা শীতল গলায় বললেন, না।

আজ কিছু ইন্টারেস্টিং ডেভলপয়েন্ট শোনা যাবে বলে আমার ধারণা।

সুরমা জবাব দিলেন না।

আলমের ঘুম ভাঙল খুব ভোরে

আলমের ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। আঁধার তখনো কাটেনি। চারদিকে ভোর হবার আগের অদ্ভুত নীরবতা। কিছুক্ষণের ভেতরই সূর্য উঠার মত বিরাট একটা ঘটনা ঘটবে। প্রকৃতি যেন তার জন্যে প্রস্তুতি নিচেছ। আলম নিঃশব্দে বিছানা থেকে নামল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক থেকে আজানের শব্দ হতে লাগল। ঢাকা শহরে এত মসজিদ আছে? আলম হকচকিয়ে গেল; ভোরবেলায় অদ্ভুত অন্ধকারে চারদিক থেকে ভেসে আসা আজনের শব্দে অন্য রকম কিছু আছে। কেমন যেন ভয়ভয় লাগে। আলমের প্রায় সারাজীবন এই শহরেই কেটেছে কিন্তু সকালবেলার এই ছবিব সঙ্গে তার দেখা হয়নি। সব মানুষই বোধ হয়। অনেক কিছু না জেনে বড় হয়।

সুরমা বারান্দায় বসে অজু করছিলেন। আলমকে বেরুতে দেখে বেশ অবাক হলেন। মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে পরিষ্কার গলায় বললেন, রাতে ঘুম হয়নি? তাঁর গলায় খানিকটা উদ্বেগ ছিল। আলমকে তা স্পর্শ করল। সে হাসিমুখে বলল, ভাল ঘুম হয়েছে। খুব ভাল। আপনি কী রোজ এ সময়ে জাগেন?

হ্যাঁ। নামাজ পড়ি। নামাজ শেষ করে আবার ঘুমিয়ে পড়ি। তারপর সাতটা সাড়ে সাতটার দিকে রাত্রি ডেকে তোলে।

সুরমা হাসতে লাগলেন। যেন খুব একটা হাসির কথা বলেছেন। ভোরবেলার বাতাসে কিছু একটা বোধ হয় থাকে। মানুষকে তরল করে ফেলে। আলম বলল, আজ আমাদের একটা বিশেষ দিন।

বুঝতে পারছি। তোমার কী ভয় লাগছে?

ভয় না। অন্য রকম লাগছে। আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব না। মেট্রিক পরীক্ষায় প্রথম ঘণ্টা পড়বার সময় যে রকম লাগে। সে রকম।

কিন্তু এ ধরনের কাজ তো তুমি এর আগেও করেছ।

তা করেছি। অবশ্যি এখানকার অবস্থাটা অন্য রকম।

তুমি কী আল্লাহ বিশ্বাস করা তোমার বয়েসী যুবকরা খানিকটা নাস্তিক ধরনের হয় সেই জন্যে বলছি।

আলম কিছু বলল না। সুরমা তার প্রশ্নের জবাবের জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। জবাব পেলেন না। তিনি হালকা গলায় বললেন, নামাজ শেষ করে এসে আমি একটা দোয়া পড়ে তোমার মাথায় ফুঁ দিতে চাই। তোমার কোনো আপত্তি আছে?

না, আপত্তি থাকবে কেন?

ঠিক আছে, আমি নামাজ শেষ করে আসছি। রাত্রিকে ডেকে দিচ্ছি সে তোমাকে চা বানিয়ে দেবে।

ডাকতে হবে না। আমার এত ঘন ঘন চা খাবার অভ্যেস নেই।

সুরমা রাত্রিকে ডেকে তুললেন। সাধারণত ফজরের নামাজ তিনি চট করে সেরে ফেলেন। কিন্তু আজ অনেক সময় নিলেন। কোথায় যেন পড়েছিলেন নামাজের শেষে পার্থিব কিছু চাইতে নেই। তাতে নামাজ নষ্ট হয়। কিন্তু আজ তিনি পার্থিব জিনিসই চাইলেন। অসংখ্যবার বললেন, এই ছেলেটিকে নিরাপদে রাখো। ভাল রাখ। সে যেন সন্ধ্যাবেলা আবার ঘরে ফিরে আসে। হারিয়ে না। যায়।

বলতে বলতে এক সময় তার চোখে পানি এসে গেল। একবার পানি এসে গেলে খুব মুশকিল। তখন যাবতীয় দুঃখের কথা মনে পড়ে যায়। কিছুতেই আর কান্না থামানো যায় না। সুরমার তার বাবার কথা মনে পড়ল। ক্যানসার হয়ে যিনি অমানুষিক যন্ত্রণা ভোগ করে মারা গেছেন। মৃত্যুর ঠিক আগে আগে পানি খেতে চেয়েছিলেন। চামচে করে পানি খাওয়াতে হয়। কী আশ্চর্য! একটা চামচ সেই সময় খুঁজে পাওয়া গেল না। শেষপর্যন্ত হাতে আঁজলা করে পানি নিয়ে গেলেন সুরমা। সেই পানি মুখ পর্যন্ত নিতে নিতে আঙুল গলে নিচে পড়ে গেল। অতি কষ্টের মধ্যেও এই দৃশ্য দেখে তাঁর বাবা হেসে ফেললেন। তার পানি খাওয়া হল না। কত অদ্ভুত মানুষের জীবন!

রাত্রি ঘরে ঢুকে দেখল, তার মা জায়নামাজে এলোমেলো হয়ে শুয়ে আছেন। কান্নার জন্যেই শরীর বারবার কোপে উঠছে। সে নিঃশব্দে বের হয়ে গেল। আলমকে চা দিয়ে আসা হয়েছে। আবার সেখানে যাওয়াটা ভাল দেখায় না। কিন্তু যেতে ইচ্ছা করছে। মাঝে মাঝে অর্থহীন গল্পগুজব করতে ইচ্ছা করে। রাত্রি আলমের ঘরে উঁকি দিল।

আবার এলাম। আপনার ঘরে।

আসুন।

চিনি হয়েছে কিনা জানতে এসেছি।

হয়েছে। থ্যাংকস।

রাত্রি খাটে গিয়ে বসল। আলমের কেমন লজ্জা করতে লাগল। রাত্রির গায়ে আলখাল্লা জাতীয় লম্বা পোশাক, সাধারণ নাইটির মত বাহারী কোন জিনিস নয়। এই পোশাকে তাকে অন্য রকম লাগছে। সে পা দুলাতে দুলাতে বলল, আপনি আজ এত ভোরে উঠেছেন কেন?

জানি না কেন। ঘুম ভেঙে গেল।

টেনশন থাকলে ভেঙে যায়।

তা যায়।

আমার উল্টোটা হয়। টেনশনের সময়ে শুধু ঘুম পায়।

একেকজন মানুষ একেক রকম।

তা ঠিক। আমরা সবাই আলাদা।

আলম সিগারেট ধরাল। তার সিগারেটের কোন তৃষ্ণা হয়নি। অস্বস্তি কাটানোর জন্যে ধারানো। তার অস্বস্তির ব্যাপারটা কী মেয়েটি টের পাচ্ছে? পাচ্ছে নিশ্চয়ই। এসব সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলি মেয়েরা সহজেই টের পায়। আলম বলল, আপনি খুব ভোরে উঠেন?

হ্যাঁ উঠি। অন্ধকার থাকতে আমার ঘুম ভাঙে। খুব খারাপ লাগে তখন।

খারাপ লাগে কেন?

সবাই ঘুমুচ্ছে। আমি জেগে আছি এই জন্যে। যখন ছোট ছিলাম তখন গেট খুলে বাইরে যেতাম। একা একা হাঁটতাম। ছোটবেলায় আমি খুব সাহসী ছিলাম।

এখন সাহসী না?

না। ছোটবেলায় আমি একটি কুৎসিত ঘটনা দেখি। তারপর আমার সব সাহস চলে যায়। আমি এখন একটি ভীরু ধরনের মেয়ে।

রাত্রি তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে। পা দুলাচ্ছে না, কাঠিন্য চলে এসেছে তার চোখে-মুখে। আলম অবাক হয়ে এই সূক্ষ্ম কিন্তু তীক্ষ্ণ পরির্বতনটি লক্ষ্য করল। রাত্রি বলল, আমি কী দেখেছিলাম তা তো জিজ্ঞেস করলেন না?

জিজ্ঞেস করলে আপনি বলবেন না, তাই জিজ্ঞেস করিনি।

ঠিক করেছেন। আমি বলতাম না, কাউকেই বলিনি। মাকেও বলিনি। যাই কেমন?

রাত্রি উঠে দাঁড়াল। এবং দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেল।

রাত্রির ফুফু, নাসিমার বয়স চল্লিশের উপরে। কিন্তু তাকে দেখে সেটা বোঝাব কোন উপায় নেই। এখনো তাকে পচিশ-ছাব্বিশ বছরের তরুণীর মত লাগে। ভিড়ের মধ্যে লোকজন তার গায়ে হাত দিতে চেষ্টা করে। একবার এরকম একটা ছোকরাকে তিনি হাতেনাতে ধরে ফেললেন এবং হাসিমুখে বললেন, তোমার বয়স কত খোকা? ছেলেটি এ জাতীয় দৃশ্যের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। সে ঘেমে নেয়ে উঠল। নাসিমা ধারাল গলায় বললেন, আমার বড় মেয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। বুঝতে পারছি?

তাঁর বড় মেয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে এটা ঠিক না। নাসিমার কোনো ছেলে।পুলে নেই। বড় মেয়ে বলতে তিনি বুঝিয়েছেন রাত্রিকে। বাইরের কেউ যদি জিজ্ঞেস করে আপনার ছেলেমেয়ে কটি? তিনি সহজভাবেই বলেন, আমার কোনো ছেলে নেই। দু'টি মেয়ে রাত্রি এবং অপালা। এটা তিনি যে শুধু বলেন। তাই না, মনেপ্রাণে বিশ্বাসও করেন। তাঁর বাড়িতে এদের দুজনের জন্যে দু'টি ঘর আছে। সেই ঘর দু'টি ওদের ইচ্ছামত সাজানো। সপ্তাহে খুব কম হলেও তিনদিন এই ঘর দু'টিতে দুবোনকে থাকতে হয়। নয়ত নাসিমা অস্থির হয়ে যান। তাঁর কিছু বিচিত্র অসুখ দেখা দেয়। হিস্টিরিয়ার সঙ্গে যার কিছু মিল আছে।

নাসিমার স্বামী ইয়াদ সাহেব লোকটি রসকষহীন; চেহারা চালচলন সবই নির্বোধের মত কিন্তু তিনি নির্বোি‌ধ নন। কোন নির্বোধি লোক একা একা একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ফাম শুরু কৰে বারো বছরেব মাথায় কোটিপতি হতে পারে না। ইয়াদ সাহেব হয়েছেন। যদিও এই বিত্ত তার জীবনযাপন পদ্ধতির ওপর কোন রকম ছাপ ফেলেনি। তিনি এখনো গায়ে তেল মেখে গোসল করেন। এবং স্ত্রীকে ভয় করেন। অসম্ভব রকম বিত্তবান লোকজনক স্ত্রীদের ঠিক পরোয়া করে না।

ভোর আটটায় নাসিমা ইয়াদ সাহেবকে ডেকে তুললেন। তাঁর ডাকার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল যে ইয়াদ সাহেবের বুক ধড়ফড় করতে লাগল। তিনি ভয়-পাওয়া গলায় বললেন, কী হয়েছে?

তোমার গাড়ি পাঠালাম রাত্রিদের আনবার জন্যে।

ও আচ্ছা।

ইয়াদ সাহেব। আবার ঘুমুবার আয়োজন করলেন।

তুমি কিন্তু আজ অফিসে-টিফিসে যাবে না।

কেন?

আজ রাত্রিকে দেখতে আসবে। তোমার থাকা দরকার।

আমি থেকে কী করব?

কিছু করবে না। থাকবে। আর কী। এসব কাজে ব্যাকগ্রাউন্ডে একজন পুরুষ মানুষ থাকা দরকার।

দরকার হলে থাকব। এখন একটু ঘুমাই, কী বল?

আচ্ছা ঘুমাও।

ইয়াদ সাহেব চোখ বন্ধ করে পাশ ফিবলেন। ছুটে যাওয়া ঘুম ফিরে এল না। কিছুদিন থেকেই তাঁর দিন কাটছে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায়। মোহাম্মদপুরে তাঁদের মূল বাড়িটি বিহারীদের দখলে। দেশ স্বাধীন না হলে এ বাড়ি ফিরে পাওয়া যাবে না। অসম্ভব। দেশ চট করে স্বাধীন হয়ে যাবে। এ রকম কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। চট করে পৃথিবীর কোনো দেশই স্বাধীন হয়নি। ইংরেজ তাড়াতে কত দিন লেগেছে? এখানেও তাই হবে। বছবের পর বছর লাগবে। তারপর এক সময় বাঙালিরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। এই একটা অদ্ভুত জাতি। নিমিষেব মধ্যে উৎসাহে পাগল হয়ে ওঠে, আবার সে উৎসাহ নিভেও যায়।

ইয়াদ সাহেব উঠে বসলেন। কাজের ছেলেটিকে বেড টি-র কথা বলে চুরুট ধরালেন। তাঁর বমি বমি ভাব হল। তিনি বিছানা থেকে নেমে হেঁটে হেঁটে বারান্দায় গেলেন। বারান্দার সামনে ঘুপসিমত গলি। মোহাম্মদপুরের বিশাল বাড়ি ছেড়ে তাকে থাকতে হচ্ছে ভাড়া বাড়িতে যার সামনে ঘুপসি গলি। তিনি বেঁচে থাকতে থাকতে কী দেশ স্বাধীন হবে? ফিরে পাওয়া যাবে নিজের বাড়ি? ইয়াদ সাহেব খানিকটা লজ্জিত বোধ করলেন। তিনি দেশের স্বাধীনতা চাইছেন ব্যক্তিগত স্বার্থে–এটা ঠিক হচ্ছে না।

চায়ের পেয়ালা নিয়ে তিনি বাসিমুখে নিজের স্টাডি রুমে ঢুকলেন। তাঁর অফিসের যাবতীয় কাগজপত্র এই ছোট্ট ঘরটিতে আছে। এখানে তিনি দীর্ঘ সময় কাটান। নিজের তৈরি বু, প্রিন্টগুলির দিকে তাকিযে থাকতে তার ভাল লাগে। কিন্তু আজ কিছুই ভাল লাগছে না। আলস্য অনুভব করছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য এখন কিছুই নেই। সব রকম কনসট্রাকশনের কাজ বন্ধ হয়ে আছে। সরকারের কাছে মোটা অংকের টাকা পাওনা। সেটা পাওয়া যাচ্ছে না। যাবেও না। সন্তাত; সব জলে যাবে। তাঁর মতে বাঙালিদের এই যুদ্ধে সবচে বেশি

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কনসট্রাকশন ফার্মগুলি। এদেব কোমর ভেঙে গেছে। এই কোমর আর ঠিক হবে না। দেশ স্বাধীন হলেও না। তিনি একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। কলিং বেল বাজছে। মেয়ে দু'টি এসেছে নিশ্চয়ই। এদের তার ভাল লাগে না। কিন্তু তবু তিনি হাসি মুখে দরজা খুলে বের হলেন। এবং অমায়িক ভঙ্গিতে বললেন রাত্রি মা, কেমন আছ?

ভাল আছি ফুফা।

অপালা মা, মুখটা এমন কালো কেন?

অপালা জবাব দিল না। সে তার ফুফাকে পছন্দ কবে না। একেবাহে না। ইয়াদ সাহেব বললেন, কী গো মা, কথা বলছি না কেন?

কথা বলতে ভাল লাগছে না, তাই বলছি না।

ইয়াদ সাহেব চুপ করে গেলেন।

আলম দোকানটির সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত কবতে লাগল। এটিই কী সেই দোকান? নাম অবশ্যি সে রকমই মডার্ন নিওন সাইনস। এখানেই সবাব জড় হবার কথা। কিন্তু দোকানটি সদর রাস্তার উপরে। তাছাড়া ভেতরে যে লোকটি বসে আছে তার চেহারা কেমন বিহারি বিহারি। কার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে বলতে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। কোন বাঙালি ছেলে এই সময়ে এমনভাবে হাসবে না। এটা হাসির সময় না। আলম দোকানে ঢুকে পড়ল।

চেক হাওয়াই শার্ট পাবা ছেলেটির ঠোঁটের উপর সুচালো গোফ। গলায় সোনার চেইন বের হয়ে আছে। রোগা টিঙটিঙে কিন্তু কথা বলার ভঙ্গি কেমন উদ্ধত। ছেলেটি টেলিফোন নামিয়ে রাগী গলায় বলল, কাকে চান?

এটা কি মডার্ন নিওন সাইন?

হ্যাঁ।

আমি আশফাক সাহেবকে খুঁজছি।

আমিই আশফাক। আপনার কী দরকার?

আমার নাম আলম।

ছেলেটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আরো তীক্ষ্ণ হল। কিন্তু কথা বলল নরম গলায়–আপনি ভেতরে ঢুকে যান। সিঁড়ি আছে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় চলে যান।

আর কেউ এসেছে?

রহমান ভাই এসেছে। যান, আপনি ভেতরে চলে যান।

ভেতরটা অন্ধকার। অসংখ্য নিওন টিউব চারদিকে ছড়ানো। একজন বুড়ো মত লোক এই অন্ধকারেই বসে কী সব নকশা করছে। সে একবার চোখ তুলে আলমকে দেখল। তার কোনো রকম ভাবান্তর হল না। চোখ নামিয়ে নিজের মত কাজ করতে লাগল।

দোতলায় দু'টি ঘর। একটিতে প্রকাণ্ড একটি তালা ঝুলছে। অন্যটি খোলা। রঙিন পর্দা ঝুলছে। রেলিং-এ মেয়েদের কিছু কাপড়। ঘরের ভেতর থেকে ক্যাসেটে গানেব শব্দ আসছে। হাওয়ামে উড়তা যায়ে মেরা লাল দুপাট্টা মলমল। আলম ধাঁধায় পড়ে গেল। সে মৃদু স্বরে ডাকল, রহমান রহমান।

রহমান বেরিয়ে এল। তার গায়ে একটা ভারী জ্যাকেট। মুখ শুকনো। এমনিতেই সে ছোটখাটো মানুষ। এখন তাকে আরো ছোট দেখাচ্ছে। রহমান হাসতে চেষ্টা করল।

আসুন আলম ভাই। তোমার এই অবস্থা কেন? কি হয়েছে? শরীর খারাপ করে ফেলেছে। জ্বর, সর্দি, কাশি বুড়োদের অসুখ-বিসুখ। একশ দুই। অসুবিধা হবে না। চারটা এ্যাসপিরিন খেয়েছি। জ্বর নেমে যাবে। সকালে একশ তিন ছিল। ভেতরে আসুন আলম ভাই।

ভেতরে কে কে আছে?

কেউ এখনো এসে পৌঁছেনি। আমি ফাস্ট, আপনি সেকেন্ড। এসে পড়বে।

আলম ঘরে ঢুকল। ছোট্ট ঘর। আসবাবপত্রে ঠাসা। বেমানান একটা কাক কার্য করা বিশাল খাট। খাটের সঙ্গে লাগোয়া একটা স্টিলের আলমারি। তার একটু দূবে ড্রেসার। জানালোব

কাছে খাটের মতই বিশাল টেবিল। এত ছোট্ট একটা ঘবে এতগুলি আসবাবেব জায়গা হল কী ভাবে কে জানে।

আলম নিচু গলায় বলল, জিনিসপত্র সব কী এখানেই?

সব না। কিছু আছে। বাকিগুলি সাদেকের কাছে। যাত্রাবাড়িতে।

আশফাক ছেলেটি কেমন?

ওয়ান হানড্রেড পারসেন্ট গোল্ড। আপনার কাছে বিহারী বিহারী লাগছিল, তাই না? চুল ছোট করে কাটায় এ রকম লাগছে। গলায় আবার চেইন-টেইন আছে। উর্দু বলে ফুয়েন্ট।

বাড়ি কোথায়?

খুলনার সাতক্ষীরায়।

ফুয়েন্ট উর্দু শিখল কবি কাছে?

সিনেমা দেখে নাকি শিখেছে। নাচে নাগিন বাজে বীণা নামের একটা ছবি নাকি সে নবার দেখেছে। আলম ভাই, পা তুলে বসেন।

আলম ঠিক স্বস্তি বোধ করছিল না। সে থেমে থেমে বলল, জায়গাটা কেমন যেন সেফ মনে হচ্ছে না।

প্রথম কিছুক্ষণ এ রকম মনে হয়। আমারো মনে হচ্ছিল। আশফাকোব সঙ্গে কথার্বাোতা বললে বুঝবেন এটা অত্যন্ত সেফ জায়গা।

ছেলেটা একটু বেশি স্মার্ট। বেশি স্মটি ছেলেপুলে কেয়ারলেস হয়। আর জায়গাটা খুব এক্সপোজাড়। মেইন রোডের পাশে।

রহমান শান্ত স্বরে বলল, মেইন রোডের পাশে বলেই সন্দেহটা কম। আইসোলেটেড জায়গাগুলি বেশি সন্দেহজনক।

আমার কেন জানি ভাল লাগছে না।

আপনার আসলে আশফাকের ওপর কনফিডেন্স আসছে না। ও যাচ্ছে আমাদের সাথে।

ও যাচ্চগে মানে?

গাড়ি চালাবে। ওর একটা পিকআপ আছে। সাদেককে তো আপনিই বলেছেন দু'টি গাড়ি থাকবে। পেছনেরটা কভার দেবে। অবশ্যি আপনি নিতে না চাইলে ওকে বাদ দেবেন।

নিচে বসে থাকা বুড়ো লোকটি চা আর ডালপুরি নিয়ে এল। রহমান শুয়ে পড়ল চোখ বন্ধ করে। তার বেশ ঘাম হচ্ছে। জুব ছেড়ে দিচ্ছে বোধ হয়। সে ক্ষীণ স্বরে বলল, চা খান আলম ভাই।

আলম চা বা ডালপুরিতে কোনো রকম আগ্রহ দেখাল না। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে দেখতে লাগল। নায়িকাদের ছবি কেটে কেটে দেয়ালে লাগানো। এর মধ্যে বেশির ভাগ ছবিই অতনু মুক্তিকর। আলম বলল, মেয়েমানুষ কেউ কী থাকে এখানে?

জি না।

রেলিং-এ মেয়েদের কিছু জামা-কাপড় দেখলাম।

আমি লক্ষ্য করিনি। আপনার মনের মধ্যে কিছু-একটা ঢুকে গেছে আলম ভাই।

আলম জবাব দিল না। গুনগুন করতে করতে আশফাক এসে ঢুকল। ফুর্তিবাজের গলায় বললচা-ডালপুরি কেউ খাচ্ছে না, ব্যাপারটা কী? ডালপুরি ফ্রেশ। আলম ভাই, খেয়ে দেখেন একটা। আপনার সঙ্গে পরিচয় করবার জন্যে এলাম।

বসুন।

ড্রাইভার হিসেবে আমাকে দলে নেন। দেখেন কী খেল দেখাই। আমার একটা পংখীরাজ আছে। দেখলে মনে হবে ঘণ্টায় দশ মাইলও যাবে না, কিন্তু আমি আশি মাইল তুলে আপনাকে দেখাব।

আলম শীতল গলায় বলল, আশফাক সাহেব, কিছু মনে করবেন না। এ জায়গাটা আমার সেফ মনে হচ্ছে না।

আশফাক হকচকিয়ে গেল। বিস্মিত গলায় বলল, সেফ মনে হচ্ছে না কেন?

জানি না কেন। ইনট্যুশন বলতে পারেন।

ঢাকা শহরে যে কয়টা সেফ বাড়ি আছে তার মধ্যে এটা একটা। আশপাশের সবাই আমাকে কড়া পাকিস্তানি বলে জানে। মান্থুদ খাঁ বলে এক ইনফেনট্রির মেজরের সঙ্গে আমার খুব খাতির। সে সপ্তাহে অন্তত একদিন আমার ঘরে আসে আড্ডা দেবার জন্যে।

আলম কিছু না বলে সিগারেট ধরাল। আশফাক বলল, এখনো কী আপনার এ বাড়ি আনসেফ মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ হচ্ছে।

তাহলে সবাই আসুক, তারপর আমরা অন্য কোথাও চলে যাব। সবাই চুপ করে গেল। আশফাককে দেখে মনে হচ্ছে সে আহত হয়েছে। হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে সে সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় সিগারেট ধরাল। নিষ্প্রাণ গলায় বলল, রহমান ভাই, আপনার জ্বর কী কমেছে?

বুঝতে পারছি না। ঘরে থার্মোমিটার আছে?

আছে।

থামোমিটার দিয়ে দেখা গেল জ্বর একশ-র অল্প কিছু উপরে কিন্তু রহমানের বেশ খারাপ লাগছে। বমির বেগ হচ্ছে। বমি করতে পারলে হয়ত একটু আরাম হবে। সে বিছানা থেকে নেমে বাথরুমের দিকে এগুলি। বাথরুমের দরজা খুলেই হড়হড় করে বমি করল। নাড়ীর্ভুড়ি

উল্টে আসছে। বলে মনে হচ্ছে। পৃথিবী দুলছে। রহমান ক্লান্ত স্বরে বলল, মাথাটা ধুইয়ে দিন তো আশফাক সাহেব। অবস্থা কাহিল।

আলম চিন্তিত মুখে বলল, তোমার শরীর তো বেশ খারাপ। কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমার চলবেও না। ডেটটা কী পিছিয়ে দেব?

আরে না। আজই সেই দিন। আমাকে নিয়ে চিন্তা করবেন না। বমি করার পর ভালই লাগছে। ঘণ্টা খানিক থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে।

রহমান চাদর গায়ে বিছানায় এসে শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ল। নিচে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। সাদেকের উঁচু গলায় ফুর্তির ছোঁয়া। যেন তারা সবাই মিলে পিকনিকে যাবার মত কোন ব্যাপার নিয়ে আলাপ করবে। রঙ্গ-তামাশা করবে।

মতিন সাহেব আজ অফিসে যায়নি। যাবার জন্যে তৈরি হয়েছিলেন। জামা জুতো পরেছিলেন। দশবার ইয়া মুকাদেমু বলে ঘর থেকেও বেরিয়েছিলেন। পিলখানার তিন নম্বর গেটের কাছে এসে একটি অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখে পাথর হয়ে গেলেন। খোলা ট্রাকে করে দু'টি অল্পবয়েসী। ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলে দু'টির হাত পেছন দিকে বাধা। ভাবশূন্য মুখ। একজনের চোখে আঘাত লেগেছে। চোখ এবং মুখের এক অংশ বীভৎসভাবে ফুলে উঠেছে। কালো পোশাকপরা এক দল মিলিশিয়া ওদের ঘিরে আছে। তাদের একজনের হাতে একটি রুমাল। সে রুমাল দিয়ে খেলার ছলে ছেলে দু'টির মাথায় ঝাপটা দিচ্ছে, বাকিরা সবাই হেসে উঠছে। ট্রাক চলছিল। কাজেই দৃশ্যটির স্থায়িত্ব খুব বেশি হলে দেড় মিনিট। এই দেড় মিনিট মতিন সাহেবের কাছে অনন্তকাল বলে মনে হল। সমস্ত ব্যাপারটাতে প্রচণ্ড হৃদয়হীন কিছু আছে। মতিন সাহেবের পা কাঁপতে লাগল। মাথা ঝিমঝিম

করতে লাগল। ব্যাপারটা যে শুধু তাঁর ক্ষেত্রেই ঘটল তা না। তাঁর আশপাশে যারা ছিল সবাই যেন কেমন হয়ে গেল। মতিন সাহেবের মনে হল ছেলে দু'টিকে ওরা যদি মারতে মারতে নিয়ে যেত তাহলে তাঁর এমন লাগত না। রুমাল দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে তামাশা করছে বলেই এমন লাগছে। তিনি বাসায় ফিরে চললেন।

পানওয়ালা ইদ্রিস বলল, অফিসে যান না?

না। শরীরটা ভাল না। দেখি একটা পান দাও।

পান খাওয়ার তার দরকার ছিল না। এ সময়ে সবাই অদরকারি কাজগুলি করে, অপ্রয়োজনীয় কথা বলে। ভয় কাটানোর জন্যেই করে। ভয় তবু কাটে না। যত দিন যায় ততই তা বাড়তে থাকে।

দু'টা ছেলেকে ধরে নিয়ে গেল। দেখলে ইদ্রিস মিয়া?

জি দেখলাম। নেন। পান নেন। মতিন সাহেব পান মুখে দিয়ে নিচু গলায় বললেন, এই অবস্থা বেশি দিন থাকবে না। আজাদহা নেমে গেছে।

বলেই তিনি হকচাকিয়ে গেলেন। একজন পানওয়ালার সঙ্গে এসব কি বলছেন? ইদ্রিস মিয়া হয়ত তার কথা পরিষ্কার শোনেনি। কিংবা শুনলেও অর্থ বুঝতে পারেনি। সে একটি আগরবাতি জ্বালাল। আগেরটি শেষ হয়ে গেছে।

সুরমা একবার জিজ্ঞেসও করলেন না— অফিসে যাওনি কেন? তিনি নিজের মনে কাজ করে যেতে লাগলেন। সাবান পানি দিয়ে ঘরের মেঝে নিজের হাতে মুছলেন। কার্পেট শুকাতে দিলেন। বাথরুমে ঢুকলেন প্রচুর কাপড় নিয়ে। আজ অনেকদিন পর কড়া রোদ উঠেছে। রোদটা ব্যবহার করা উচিত।

মতিন সাহেব কি করবেন ভেবে পেলেন না। কিছুক্ষণ বারান্দায় বসে রইলেন। তারপরই তার মনে হল অফিসে না গিয়ে তিনি বারান্দায় বসে আছেন এটা লোকজনের চোখে পড়বে। তিনি ভেতরের ঘরে গেলেন। ঝকঝকে মেঝে মাড়িয়ে যেতে খারাপ লাগে। সুরমা কিছু বলছেন না। কিন্তু তাকিয়ে আছেন কড়া চোখে। মতিন সাহেব বাগানে গেলেন। বাগান মানে বারান্দার কাছ ঘেষে এক চিলতে উঠোন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি এখানে শাকসব্জি ফলাবার চেষ্টা করছেন। ফলাতে পারেননি। মরা মরা ধরনের কিছু গাছপালা হয়ে কিছুদিন পর আপনা-আপনি শুকিয়ে যায়। সার-টার সব দিয়েও একই অবস্থা। নিজেই একবার মাটি নিয়ে জয়দেবপুর গিয়েছিলেন সয়েল টেস্টিং-এর জন্যে। তারা এক সপ্তাহ পর যেতে বলল। তিনি গেলেন এক সপ্তাহ পর। তিন ঘণ্টা বসে থাকার পর কামিজ পরা অত্যন্ত স্মার্ট একটি মেয়ে এসে বলল, আপনার স্যাম্পল তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি কী কষ্ট করে আরেকবার খানিকটা স্যাম্পল দিয়ে যেতে পারবেন? দু'একদিনের মধ্যে নিয়ে আসুন। তিনি নিয়ে যাননি।

কয়েকদিন ক্রমাগত বৃষ্টির জন্যে বাগানে কাদা হয়েছে। জুতো সুদ্ধ পা অনেকখানি কাদায় ডেবে গেল। তিনি অবশ্যি তা লক্ষ্য করলেন না। কারণ তার চোখ গিয়েছে কাকরুল গাছের দিকে। কাকরুল গাছ যে বাগানে হয়েছে তা তার মনে ছিল না। আজ হঠাৎ দেখলেন একটা সতেজ গাছ। চড়া সবুজ রঙের পাকা চকচক করছে। তার চেয়েও বড় কথা–পাতার

ফাকে বড় বড় কাঁকরুল ঝুলছে। কেউ লক্ষ্য করেনি। একটি আবার পেকে হলুদ বর্ণ হয়েছে। মতিন সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন–রাত্রি, রাত্রি। রাত্রি বাসায় নেই। ভোরবেলা তার চোখের সামনে গাড়ি এসে নিয়ে গিয়েছে তা তার মনে রইল না। উত্তেজিত স্বরে তিনি দ্বিতীয়বার ডাকলেন – রাত্রি, রাত্রি।

সুরমা ঘর মোছা বন্ধ করে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ বিষন্ন। খানিকটা উদ্বেগ মিশে আছে সেখানে। তিনি বললেন, কি হয়েছে?

সুরমা, কাঁকরুল দেখে যাও। গাছ ভর্তি হয়ে আছে। কেউ এটা লক্ষ্যই করে নাই। কি কাণ্ড! সুরমা সত্যি সত্যি নেমে এলেন। তাঁর যা স্বভাব তাতে নেমে আসার কথা নয়। নোংরা কাদা থিকথিক বাগানে পা দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

সুরমা, দেখ দেখ, পুঁই গাছটার দিকে দেখ। কেন এসব এতদিন কেউ দেখল না?

মতিন সাহেব গভীর মমতায় গাছের পাতায় হাত বুলাতে লাগলেন।

শুধু পুঁই গাছ নয়। রান্নাঘরের পাশের খানিকটা জায়গায় ডাটা দিয়েছিলেন। লাল লাল পুরুষ্ট ডাটা সেখানে। নিস্বফলা মাটিতে হঠাৎ করে প্রাণ সঞ্চার হল নাকি? আনন্দে মতিন সাহেবের দম বন্ধ হয়ে যাবার মত হল। রাত্রিকে খবর দিতে হবে। ওরা এলে একসঙ্গে সবজি তোলা হবে। তাছাড়া বাগান পরিষ্কার করতে হবে। বড় বড় ঘাস জন্মেছে। এদের টেনে তুলতে হবে। মাটি কুপাতে হবে। ডাটা ক্ষেতে পানি জমেছে, নালা কেটে পানি সরাতে হবে। অনেক কাজ। অফিসে না গিয়ে ভাল হয়েছে। রাত্রিকে খবর দেয়া দরকার। মতিন সাহেব কাদামাখা জুতো নিয়েই শোবার ঘরে ঢুকে পড়লেন। রাত্রিকে টেলিফোন

করলেন। সুরমা দেখলেন তার ধোয়া-মোছা মেঝের কি হাল হল। কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না।

রাত্রিকে টেলিফোনে পাওয়া গেল না। নাসিমা বলল, ওর সঙ্গে এখন কথা বলা যাবে না। তুমি ঘণ্টাখানিক পরে রিং করবে।

মতিন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, এখন সে কি করছে?

একজন ভদ্রমহিলা তাকে দেখতে এসেছেন। সে কথা বলছে তার সঙ্গে।

কেন দেখতে এসেছে রাত্রিকে?

কেন তুমি জান না? তোমাকে তো বলা হয়েছে।

নাসিমা ব্যাপারটা কি খুলে বল তো!

এখন বকবক করতে পারব না। রান্নাবান্না কবছি। উনি খাবেন। এখানে।

কে এখানে খাবেন?

দাদা, পরে তোমাকে সব গুছিয়ে বলব। এখন রেখে দেই। তুমি বরং অপালার সঙ্গে কথা বল। ওকে ডেকে দিচ্ছি।

মতিন সাহেব রিসিভার কানে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অপালা আসছেই না। কোন একটা গল্পের বই পড়ছে নিশ্চয়ই। গল্পের বই থেকে তাকে উঠিয়ে আনা যাবে না। তিনি যখন টেলিফোন রেখে দেবেন বলে মন ঠিক করে ফেলেছেন তখন অপালার চিকন গলা শোনা গেল।

হ্যাঁলো বাবা।

হুঁ।

কি বলবে তাড়াতাড়ি বল।

মতিন সাহেব উৎকণ্ঠিত স্বরে বললেন, তোদের ওখানে কি হচ্ছে?

আপার বিয়ে হচ্ছে।

কি বললি?

আপার বিয়ে হচ্ছে। বিবাহ। শুভ বিবাহ।

কী বলছিস এসব কিছু বুঝতে পারছি না।

অপালা বিরক্ত স্বরে বলল, বাবা, আমি এখন রেখে দিচ্ছি। সে সত্যি সত্যি টেলিফোন রেখে দিল।

রাত্রি পা বুলিয়ে খাটে বসে আছে। তার সামনে বসে আছেন মিসেস রাবেয়া করিম। রাত্রির ধারণা ছিল একজন বুড়োমত মহিলা আসবেন। তার পরনে থাকবে সাদা শাড়ি। তিনি আড়চোখে রাত্রিকে কয়েকবার দেখে ভাসা ভাসা ধরনের কিছু প্রশ্ন করবেন–বাড়ি কোথায়? ক ভাইবোন? কী পড়? কিন্তু তার সামনে যিনি বসে আছেন তিনি সম্পূর্ণ অন্য রকম মহিলা। রেডক্রস লাগানো কালো একটি মরিস মাইনর গাড়ি নিজে চালিয়ে নিয়ে এসেছেন। মহিলাদের গাড়ি চালানো এমন কিছু অদ্ভুত ব্যাপার নয়। অনেকেই চালাচ্ছে। নাসিমাও চালায় কিন্তু এই সময়ে একজন একা একা গাড়ি করে যাওয়া-আসা করে না।

ভদ্রমহিলা বেশ লম্বা। মাথার চুল কাঁচাপাকা। মুখটি কঠিন হলেও চোখ দু'টি হাসি হাসি। অসম্ভব আত্মবিশ্বাসী একজন মহিলা। রাত্রিকে দেখে প্রথম যে কথাটি বললেন তা হচ্ছে– তোমার ইন্টারভ্যু নিতে এলাম মা। রাত্রি হকচাকিয়ে গেল।

প্রথমে নিজের পরিচয় দিয়ে নেই। আমি একজন ডাক্তার। মেডিকেল কলেজে গাইনির এসোসিয়েট প্রফেসর। আমার নাম রাবেয়া। তোমার ভাল নামটি কী?

ফারজানা।

তুমি বস এবং বল এত সুন্দর তুমি কি ভাবে হলো? এটা আমার প্রথম প্রশ্ন। খুব কঠিন প্রশ্ন। ভদ্রমহিলা হাসতে লাগলেন। রাত্রি কী বলবে ভেবে পেল না। হঠাৎ করে কেউ সুন্দর হয় না। এর পেছনে জেনেটিক কারণ থাকে। মনের সৌন্দর্য একজন নিজে নিজে ডেভেলপ করাতে পারে। কিন্তু দেহের সৌন্দর্য উত্তরাধিকার সূত্রে পেতে হয়। বল, তোমার মা এবং বাবা এদের দুজনের মধ্যে কে সুন্দর?

মা।

শোন রাত্রি, তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। তা কিছুই মিন করে না। তোমার পছন্দ-অপছন্দ আছে। এবং আমার মনে হচ্ছে তুমি খুব খুতখুতে ধরনের মেয়ে। আমি কী ঠিক বলেছি?

ঠিকই বলেছেন।

ভদ্রমহিলা চা খেলেন। অপালার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করলেন এবং এক পর্যায়ে একটি হাসির গল্প বললেন। হাসির গল্পটি একটি ব্যাঙ নিয়ে। পরপর কয়েকদিন বৃষ্টি হওয়ায় ব্যাঙটির সর্দি হয়ে গেছে। ব্যাঙ সমাজে ছিঃ ছিঃ পড়ে গেছে। বেশ লম্বা গল্প। অপালা মুগ্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর পর হাসিতে ভেঙে পড়তে লাগল।

ভদ্রমহিলা এসেই বলেছিলেন আধঘণ্টা থাকবেন। কিন্তু তিনি পুরোপুরি তিন ঘণ্টা থাকলেন। দুপুরের খাবার খেলেন। খাবার শেষ করে রাত্রিকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে গেলেন। অস্বাভাবিক নরম গলায় বললেন, মা, তোমাকে কী আমি আমার ছেলের সম্পর্কে দু'একটি কথা বলতে পারি?

রাত্রি লজ্জিত স্বরে বলল, বলুন।

তার সবচে দুর্বল দিকটির কথা আগে বলি। ওর থিংকিং প্রসেসটা একটু স্লো বলে আমার মনে হয়। যখন কেউ কোনো হাসির কথা বলে তখন সে প্রায়ই বুঝতে পারে না। বোকা মানুষদের মত বলে –ঠিক বুঝতে পারলাম না।

রাত্রি অবাক হয়ে ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে রইল। তিনি এই কথাটি বলবেন তা বোধ হয়। সে ভাবেনি।

এখন বলি ওর সবচে সবল দিকটির কথা। পুরনো দিনের গল্প-উপন্যাসে এক ধরনের নায়ক আছে যারা জীবনে কোন পরীক্ষাতে সেকেন্ড হয় না; ও সে রকম একটি ছেলে। মা, আমি খুব খুশি হব তুমি যদি খানিকক্ষণ ওর সঙ্গে কথা বল। আমার ধারণা, কিছুক্ষণ কথা বললেই তোমার ওকে পছন্দ হবে। অবশ্যি ও কথা বলবে কিনা জানি না। যা লাজুক ছেলে!

ছেলেটিকে না দেখেই রাত্রির কেমন যেন পছন্দ হল। কথা বলতে ইচ্ছা হল। তার একটু লজ্জা লজ্জাও লাগল। ভদ্রমহিলা বললেন, মা, তুমি কী ওর সঙ্গে কথা বলবে?

হ্যাঁ বলবে।

থ্যাংক য়্যু। যাই কেমন? যাই বলার পরও তিনি আরো কিছুক্ষণ থাকলেন। নাসিমার সঙ্গে গল্প করলেন। অপালাকে আরো একটি হাসির গল্প বললেন। সেই গল্পটি তেমন জমল না। অপালা গম্ভীর হয়ে রইল।

ওরা মডার্ন নিওন সাইন থেকে বেরুল দুপুর দুটায়। রহমানকে রেখে যেতে হল। কারণ তার উঠে দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই। আলম চেয়েছিল রহমানকে তার জায়গায় রেখে আসতে। দলের সবাই আপত্তি করল। নাড়াচাড়া করার কোনো দরকার নেই। এখানে বিশ্রাম করুক।

আশফাক বলল, জহুর মিয়া আছে সে দেখাশোনা করবে। দরকার হলে চেনা একজন ডাক্তার আছে তাকে নিয়ে আসবে। কোনই অসুবিধা নেই।

আলম গম্ভীর হয়ে রইল। রহমানকে বাদ দিয়ে আজকের অপারেশন শুরু করতে তার মন চাইছে না। এবং কেন যেন জায়গাটাকে তার নিরাপদ মনে হচ্ছে না। সারাক্ষণই মনে হচ্ছে কিছুএকটা হবে।

এরকম মনে হবার তেমন কোন কারণ নেই। এই শহরে মিলিটারিরা নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করছে। এরা এখানে শংকিত নয়। আলাদাভাবে কোনো বাড়িঘরের দিকে নজর দেবে না। নজর দেবার কথাও নয়। সাদেক বলল, আলম, তুই এত গাম্ভীর কেন? ভয় পাচ্ছিস নাকি? আলম বলল, বেরিয়ে পড়া যাক।

তারা উঠে দাঁড়াল। আশফাককে নিয়ে ছজনের একটি দল। আলম বলল, রহমান চললাম। রহমান উত্তর দিল না। তাকিয়ে রইল। তার জ্বর নিশ্চয়ই বেড়েছে। চোখ ঘোলাটে। জ্বরের জন্য মুখ লাল হয়ে আছে।

তারা রাস্তায় বেরুতেই একটি মিলিশিয়াদের ট্রাক চলে গেল। মিলিশিয়ারা ভাবলেশহীন মুখে তাকিয়ে আছে। মনে হয়, অল্প কিছুদিন হল এ দেশে এসেছে। নতুন পরিবেশে নতুন ধরনের জীবনযাত্রায় এখনো অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি।

সাদেক বলল, রওনা হবার আগে পান খেলে কেমন হয়? কেউ পান খাবে?

জবাব পাওয়া গেল না। সাদেক লম্বা লম্বা পা পেলে পান। কিনতে গেল। নূরু বলল, সাদেক ভাইয়ের খুব ফুর্তি লাগছে মনে হয়। হাসতে হাসতে কেমন গল্প জমিয়েছে দেখেন।

সাদেক সত্যি সত্যি হাত-পা নেড়ে কী সব বলছে। সিগারেট কিনে শীস দিতে দিতে আসছে। এই ফুর্তির ভাবটা কতটুকু আন্তরিক বোঝার উপায় নেই। ফুর্তির ব্যাপারটা কারো কারো চরিত্রের মধ্যেই থাকে। হয়ত সাদেকেরও আছে।

আলম আকাশের দিকে তাকাল। নির্মেঘ আকাশ। ঘন নীলবর্ণ। বর্ষাকালে আকাশ এত নীল হয় না। আজ এত নীল কেন?

ভদ্রলোকের পরনে হাফ হাওয়াই শার্ট

ভদ্রলোকের পরনে হাফ হাওয়াই শার্ট। বয়স খুব বেশি হলে পঁয়ত্রিশ হবে। কালো ফ্রেমের ভারী চশমার জন্যে বয়স কিছু বেশি মনে হচ্ছে। বেশ লম্বা, হাঁটছেন মাথা নিচু করে। তাঁর ডান হাতে একটি প্যাকেট। বা হাত ধরে একটি মেয়ে হাঁটছে।–তার বয়স পাঁচ-ছবছর। ভারি মিষ্টি চেহারা। তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। ছোট মেয়েটি ক্রমাগত কথা বলছে। ভদ্রলোক তার কোনো কথার জবাব দিচ্ছেন না। ভদ্রলোকের কম কথা বলার স্বভাবের সঙ্গে মেয়েটি পরিচিত। তাদের গাড়িটি বেশ খানিকটা দূরে পার্ক করা। তারা ছোট ছোট পা ফেলে গাড়ির দিকে যাচ্ছে। জায়গাটা বায়তুল মোকাররম। সময় তিনটা পাঁচ।

ভদ্রলোকের গাড়িটি নতুন। সাদা রঙের টয়োটা করোলা। ফোর ডোর। রাস্তার বাঁয়ে দৈনিক ংলার দিকে মুখ ফিরিয়ে প্যারালাল পার্ক করা। গাড়িটির কাছে পৌঁছতে হলে রাস্তা পার হতে হয়।

তিনি সাবধানে রাস্তা পার হলেন। লক্ষ্য করলেন তাঁর সঙ্গে দু'টি ছেলেও রাস্তা পার হল। এরা বারবার তোকাচ্ছে তার দিকে। ভদ্রলোক একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। এই ছেলে দু'টি অনেকক্ষণ ধরেই আছে তাঁর সঙ্গে। ব্যাপার কী? তিনি গাড়ির হাতলে হাত রাখামাত্র চশমা পরা লম্বা ছেলেটি এগিয়ে এল।

আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

আমার সঙ্গে কী কথা? আমি আপনাকে চিনি না।

ভদ্রলোক গাড়ির দরজা খুললেন। ছেলেটি শীতল কণ্ঠে বলল, গাড়িতে উঠবেন না। আপনার গাড়িটি দরকার। চিৎকার-চেঁচামেচি কিছু করবেন না। যেভাবে দাঁড়িয়ে আছেন সেভাবে দাঁড়িয়ে থাকুন।

ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রইলেন। ছোট মেয়েটি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। লম্বা ছেলেটি বলল, আমরা মুক্তিযোদ্ধার একটি গেরিলা ইউনিট, কিছুক্ষণের ভেতর ঢাকা শহরে অপারেশন চালাব। আপনার গাড়িটা দরকার। চাবি দিয়ে দিন।

ভদ্রলোক চাবি তুলে দিলেন।

গাড়িতে কোন সমস্য নেই তো? ভাল চলে?

নতুন গাড়ি, খুবই ভাল চলে। তেল নেই। আপনাদের তেল নিতে হবে।

নিয়ে নেব।

তেল কিনার টাকা আছে তো? টাকা না থাকলে আমার কাছ থেকে নিতে পারেন।

টাকা আছে।

ভদ্রলোক হাসছেন। তিনি তাঁর মেয়ের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে মেয়েকে আশ্বস্ত করলেন। নরম স্বরে বললেন, মা, এঁদের স্লামালিকুম দাও।

মেয়েটি চুপ করে রইল। তার চোখে স্পষ্ট ভয়। সে অল্প অল্প কাঁপছে।

আপনি এখন থেকে ঠিক দুঘণ্টা পর থানায় ডায়েরি করবেন যে আপনার গাড়িটি চুরি হয়েছে। এর আগে কিছুই করবেন না।

ভদ্রলোক মাথা ঝাঁকালেন এবং হাত বাড়িয়ে দিলেন। ভদ্রলোকের হাত মেয়েদের হাতের মত কোমল।

আমার নাম ফারুক চৌধুরী। আমি একজন ডাক্তার। এ তৃণা, আমার বড় মেয়ে। আজ ওর জন্মদিন। আমরা কেক কিনতে এসেছিলাম।

লম্বা ছেলেটি বলল আমার নাম আলম। বদিউল আলম, শুভ জন্মদিন তৃণা।

আলম গাড়িতে উঠে দরজা লাগিয়ে দিল। গাড়ি চালাবে গৌরাঙ্গ। আলম বসেছে গৌরাঙ্গের পাশে। পেছনের সিটে সাদেক এবং নূরু।

আশফাকের গাড়িতে থাকবে শুধু নাজমুল। বেশি মানুষের সেখানে থাকার দরকার নেই। এটি হচ্ছে কভার দেয়ার গাড়ি। একটি সেলফ লোডিং রাইফেল হাতে নাজমুল একাই যথেষ্ট। সে মহা ওস্তাদ ছেলে। উৎসাহ একটু বেশি। তবে সেই বাড়তি উৎসাহের জন্যে এখন পর্যন্ত কাউকে বিপদে পড়তে হয়নি। আজও বিপদে পড়তে হবে না।

দু'টি গাড়ি মগবাজার এলাকার দিকে চলল। আশফাকের গাড়িটিতে অস্ত্রশস্ত্র আছে। তার কিছু কিছু সামনের টয়োটায় তুলতে হবে।

আলম ও সাদেকের হাতে থাকবে স্টেইনগান। ক্লোজ রেঞ্জ উইপন। ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলে এটি একটি চমৎকার অস্ত্র। গেরিলাদের জন্যে আদর্শ। ছোট এবং হালকা। নূরুর দায়িত্বে এক বাক্স গ্রেনেড। নূরু হচ্ছে গ্রেনেড জাদুকর। নিশানা, ছুড়বার কায়দা, টাইমিং কোথাও কোনো খুঁত নেই। অথচ এই ছেলে মহা বিপদ ঘটাতে যাচ্ছিল।

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সার্জেন্ট মেজর ময়না মিয়া গ্রেনেড ছুড়বার ট্রেনিং দিচ্ছেন। পরিষ্কার করে সব বুঝিয়ে দিলেন–পিনটা খুলবার পর হাতে সময় হচ্ছে সাত সেকেন্ড। খেয়াল রাখবেন সাত সেকেন্ড। মনে হচ্ছে খুব কম সময়। আসলে অনেক বেশি সময়। সাত সেকেন্ডে অনেক কিছু করা যায়। ব্রাদারস, খেয়াল রাখবেন সাত সেকেন্ড অনেক সময়। পিন খুলে নেবার পর যদি শুধু চিন্তা করতে থাকেন। এই বুঝি ফাটল, এই বুঝি ফাটল তাহলে মুশকিল। মনের ভয়ে তাড়াহুড়া করবেন, নিশানা ঠিক হবে না। খেয়াল রাখবেন, সাত সেকেন্ড অনেক সময়। অনেক সময়।

নূরুকে গ্রেনেড দিয়ে পাঠানো হল। ছুড়বার ট্রেনিং হবে। নূরু ঠিকমতই গ্রেনেডের পিন দাঁত দিয়ে খুলল। তারপর সে আর ছুড়ে মারছে না। হাতে নিয়ে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। ময়না মিয়া চেচাল, ছুড়ে মারেন, ছুড়ে মারেন। দাঁড়িয়ে আছেন কেন? নূরু কঁপা গলায় বলল, আমার হাত শক্ত হয়ে গেছে, ছুড়তে পারছি না। নূরুর মুখ রক্তশূন্য।

বিদ্যুতের গতিতে ছুটে গেলেন ময়না মিয়া। গ্রেনেড কেড়ে নিয়ে ছুড়ে মারবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হল। ময়না মিয়া নূরুকে নিয়ে মাটিতে শোবারও সময় পেলেন না। সৌভাগ্যক্রমে কারো কিছু হল না। ময়না মিয়া ঠাণ্ডা গলায় বললেন, নুরু ভাই, আরেকটা

গ্রেনেড ছুড়েন। এখন আমি আছি আপনার কাছে। নূরু বলল, আমি পারব না। ময়না মিয়া প্রচণ্ড একটা চড় কষালেন। তারপর বললেন, যা বলছি করেন।

নূরু গ্রেনেড ছুড়ল। সার্জেন্ট মেজর ময়না মিয়া বললেন, নূরু ভাই হবেন গ্রেনেড মারায় এক নম্বর।

ময়না মিয়ার কথা সত্যি হয়েছে। ময়না মিয়া তা দেখে যেতে পারেননি। মান্দার অপারেশনে মারা গেছেন।

আলম ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। ময়না মিয়া কথা মনে হলেই মন দ্রবীভূত হয়ে যায়, বুক হুঁ-হু করে। দেশ স্বাধীন হবার আগে কী দেশের বীরপুত্রদের সবাই শেষ হয়ে যাবে?

.

আলম।

বল।

গাড়ি কোথাও রাখতে হবে, আমার পেচ্ছাব করতে হবে। কিডনি প্রেসার দিচ্ছে। একটা নর্দমার কাছে গাড়িটা থামা তো গৌরাঙ্গ।

গৌরাঙ্গ গাড়ি থামাল।

গাড়ি এগুচ্ছে খুব ধীরে। যেন কোন রকম তাড়া নেই। গৌরাঙ্গ পেছনের পিকআপটির দিকে লক্ষ্য রাখতে চেষ্টা করছে। ব্যাক মিররটা ভাল না। বাঁকা হয়ে আছে। পেছনে কে আসছে দেখার জন্যে ঘাড় বাঁকা করতে হয়। আলমের মনে হল গৌরাঙ্গ বেশ নাভাস।

গৌরাঙ্গ।

বলেন।

পেছনের দিকে লক্ষ্য রাখার তোমার কোনো দরকার নেই। তুমি চালিয়ে যাও।

জি আচ্ছা।

এত আস্তে না। আরেকটু স্পিডে চালাও। রিকশা তোমাকে ওভারটেক করছে।

গৌরাঙ্গ মুহূর্তে স্পিড বাড়িয়ে দিল। তার এতটা নার্ভাস হবার কারণ কী? আলম পরিবেশ হালকা করার জন্যে বলল, সেন্ট মেখেছি নাকি গৌরাঙ্গ? গন্ধ আসছে। কড়া গন্ধ।

গৌরাঙ্গ লজ্জিত স্বরে বলল, সেন্ট না। আফটার শেভ দিয়েছি।

দাড়ি-গোঁফ গজাচ্ছে না। আফটার শেভ কেন? সবাই হেসে উঠল। গৌরাঙ্গও হাসল। পরিবেশ হালকা করার একটা সচেতন প্রচেষ্টা। সবার ভাবভঙ্গি এ রকম যেন বেড়াতে যাচ্ছে। আলগা একটা ফুর্তির ভাব। কিন্তু বাতাসে উত্তেজনা। রক্তে কিছু একটা নাচছে। প্রচুর পরিমাণে এড্রোলিন চলে এসেছে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে। সবার নিঃশ্বাস ভারী। চোখের মণি তীক্ষ্ণ। গৌরাঙ্গের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সে সিগারেট ধরাল। স্টিয়ারিং

হুঁইলে হাত রেখে সিগারেট ধরানোর কৌশলটা চমৎকার। আলম তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। তামাকের গন্ধ ভাল লাগছে না। গা গুলাচ্ছে। আলম একবার ভাবল, বলে–সিগারেট ফেলে দাও গৌরাঙ্গ। বলা হল না।

সাদেক পেছনের সিটে গা এলিয়ে দিয়েছে। তার চোখ বন্ধ। সে বলল, আমি একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছি। সময় হলে জাগিয়ে দিও। রসিকতার একটা চেষ্টা। স্থূল ধরনের চেষ্টা। কিন্তু কাজ দিয়েছে। নূরু এবং গৌরাঙ্গ দাঁত বের করে হাসছে। সাদেক এই হাসিতে আরো উৎসাহিত হল। নাক ডাকার মত শব্দ করতে লাগল।

গাড়ি নিউ মার্কেটের সামনে দিয়ে সোজা ঢুকল মীরপুর রোডে। লালমাটিয়ার কাছাকাছি এসে ডানদিকে টার্ন নিয়ে চলে যাবে ফার্মগেট। সেখান থেকে হোটেল ইন্টারকনি। কাগজে-কলমে কত সহজ। বাস্তব অন্য জিনিস। বাস্তবে অদ্ভুত অদ্ভুত সব সমস্য হয়। মিশাখালিতে যে রকম হল। খবর পাওয়া গেল দশজন রাজাকার নিয়ে তিনজন মিলিটারির একটা দল সুলেমান মিয়ার ঘরে এসে বসে আছে, ডাব খাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে সাদেক দলবল নিয়ে রওনা হয়ে গেল। দুতিনটা গুলি ছুড়লেই রাজাকাররা তাদের পাকিস্তানি বন্ধুদের ফেলে পালিয়ে যাবে। অতীতে সব সময়ই এ রকম হয়েছে কিন্তু সেবার হয়নি। সুলেমান মিয়ার ঘরে যারা বসে ছিল তারা সবাই পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একটি কমান্ডো ইউনিট। গ্রামে ঢুকেছে গানবোট নিয়ে। সাদেক মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছে। যাদের নিয়ে গিয়েছিল তাদের সবাইকে প্রায় রেখে আসতে হয়েছিল। ভয়াবহ অবস্থা।

নাজমুল বলল, আপনার ভয় লাগছে নাকি আশফাক সাহেব?

আশফাক ঠাণ্ডা গলায় বলল, আমার এত ভয় নাই।

অ্যাকশন কখনো দেখেননি এই জন্যে ভয় নেই। একবার দেখলে বুকের রক্ত পানি হয়ে যায়। খুব খারাপ জিনিস।

আশফাক ব্রেকে পা দিল। সামনে একটা ঝামেলা হয়েছে। অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে বোধ হয়। একটা ঠেলাগাড়ি উল্টে পড়ে আছে। তার পাশে হেডলাইট ভাঙা একটা সবুজ রঙের জিপ। প্রচুর লোকজন এদের ঘিরে আছে। আশফাক ভিড় কমাবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। ভিড় কমছে। না। একজন ট্রাফিক পুলিশ মেয়েদের মত মিনমিনে গলায় কী সব বলছে, কেউ তার কথা শুনছে। না। নাজমুল বিরক্ত স্বরে বলল, ঝামেলা হয়ে গেল দেখি।

আশফাক নির্বিকার। যেন কিছুই হয়নি। সে জানালা দিয়ে মাথা বের করে ব্যাপারটা দেখবার চেষ্টা করছে। মনে হচ্ছে সে এই ঝামেলাটায় বেশ মজা পাচ্ছে। কত অদ্ভুত মানুষ থাকে।

ভিড় চট করে কেটে যেতে শুরু করেছে। কারণ হচ্ছে ইপিআর এক নম্বর গেট থেকে একটি সাদা রঙের জিপ বাঁশি বাজাতে বাজাতে আসছে।

গৌরাঙ্গ একামিলেটরে পা দিল। নূরু বলল, যাত্রা শুভ না আলম ভাই। যাত্রা খারাপ।

এ ধরনের কথাবার্তা খুবই আপত্তিজনক। মনের ওপর বাড়তি চাপ পড়ে। এই মুহুর্তে আর কোনো বাড়তি চাপের প্রয়োজন নেই। আলম ঠাণ্ডা গলায় বলল, শুভ কাজের জন্যে যে যাত্রা তা সব সময়ই শুভ। গৌরাঙ্গ স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছে। হুঁ-হু করে হাওয়া আসছে

জানালা দিয়ে। লালমাটিয়ার কাছাকাছি আসতেই আবার ব্রেকে পা দিতে হল। গৌরাঙ্গ শুকনো গলায় বলল, আলম ভাই কী করব বলেন? ছুটে বেড়িয়ে যাব?

না, গাড়ি থামাও।

ভাল করে ভেবে বলেন।

গাড়ি থামাও। সবাই তৈরি থাক।

গাড়ি রাস্তার পাশে এসে থামল। আশফাকও তার পিকআপ থামিয়েছে।

তাদের সামনে দু'টি গাড়ি থেমে আছে। একটি ত্রিপল ঢাকা ট্রাক, অন্যটি ভোক্সওয়াগন। মুখ শুরু করে কয়েকজন লোক গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এরা ভয়ে অস্থির।

যারা গাড়ি থামাচ্ছে তারা মিলিটারি পুলিশ। একেকটা গাড়ি আসছে... হুঁইসেল দিয়ে হাত ইশারা করছে। গাড়ি থামামাত্র এগিয়ে যাচ্ছে–কাগজপত্র নিয়ে আসছে।

সংখ্যায় তারা চারজন। ভাল ব্যাপার হচ্ছে এই চারজনই দাঁড়িয়ে আছে কাছাকাছি। ছড়িয়েছিটিয়ে নেই। এদের একজনের সঙ্গে রিভলবার ছাড়া অন্য কিছু নেই। বাকি তিনজনের সঙ্গে আছে চাইনিজ রাইফেল।

আলম বলল, সাদেক তুই একা আমার সঙ্গে নামবি। অন্য কেউ না।

গৌরাঙ্গ।

বলুন।

সিগারেট এখন ফেলে দাও।

গৌরাঙ্গ সিগারেট ফেলে দিল। আলম জানালা দিয়ে মুখ বের করে হাত ইশারা করে ওদের ডাকল। মিলিটারি পুলিশের দলটি ক্রুদ্ধ ও অবাক হয়ে দৃশ্যটি দেখল। হাত ইশারা করে ওদের ডাকার স্পর্ধা এখনো কারোর আছে তা তাদের কল্পনাতেও নেই। একজন এগিয়ে আসছে, অন্য তিনজন দাঁড়িয়ে আছে।

আলম নামল খুব সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। তার পেছনে নামল সাদেক। সাদেকের মুখ ভর্তি হাসি।

এরা বুঝতে পারল না। এই ছেলে দু'টি ভয়াবহ অস্ত্র নিয়ে নেমেছে। এদের স্নায়ু ইস্পাতের মত।

প্রচণ্ড শব্দ হল গুলির। একটি গুলি নয়। এক ঝাক গুলি। ফাঁকা জায়গায় এত শব্দ হবার কথা নয়। কিন্তু হল। চারজনেই গড়িয়ে পড়ছে। এখনো রক্ত বেরুতে শুরু করেনি। ওদের মুখে আতংক ও বিস্ময়।

নাজমুল নেমে পড়েছে তার হাতে এসএলআর। আলম বলল, গাড়িতে উঠ নাজমুল। নেমেছ কেন?

দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলি একটা ঘোরের মধ্যে আছে কী হয়ে গেল তারা এখনো বুঝতে পারছে না। সাদেক বলল, আপনারা দাঁড়িয়ে থাকবেন না। তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যান। লোকগুলির একজন শব্দ করে কাঁদছে। কী জন্যে কাঁদছে কে জানে। এখানে তার কাঁদবার কী হল?

এখানকার ঘটনা প্রচার হতে সময় লাগবে। তারা ফার্মগেটে পৌঁছে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। অবশ্যি গুলির শব্দ ওরা হয়ত পেয়েছে। এতে তেমন কোনো অসুবিধা হবার কথা নয়। এই শহরে গেরিলারা এসেছে এটা ওদের কল্পনাতেও নেই।

গাড়ি চলা শুরু করতেই সাদেক বলল, আমার বাথরুম পেয়ে গেছে। কেউ কোনো উত্তর দিল না। সাদেক আবার বলল, ডায়াবেটিস হয়ে গেল নাকি? এই কথারও কোনো জবাব পাওয়া গেল না।

গৌরাঙ্গ আবার একটি সিগারেট ধরিয়েছে। তার ফর্সা আঙুল অল্প অল্প কাঁপছে। আলম বলল, ভয় লাগছে গৌরাঙ্গ?

গৌরাঙ্গ সত্যি কথা বলল।

হ্যাঁ, লাগছে। বেশ ভয় লাগছে।

আলম তাকাল পেছনে। সাদেক চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে। স্টেইনগানটি তার কোলে। কেমন খেলনার মত লাগছে। নূরু বসে আছে শক্ত মুখে। আলমের দিকে চোখ পড়তেই সে বলল, কিছু বলবেন আলম ভাই?

না কিছু বলব না।

সিগারেট ধরাবেন একটা?

না।

ঠিক এই মুহূর্তে কিছুই বলার নেই। কিছুই করার নেই। এটা হচ্ছে প্রতীক্ষার সময়। আলম লক্ষ্য করল বারবার তার মুখে থুথু জমা হচ্ছে। কেন এরকম হচ্ছে? তার কী ভয় লাগছে? তার সঙ্গে আছে চমৎকার একটি দল। এরা প্রথম শ্রেণীর কমান্ডে ট্রেনিং পাওয়া দল। এদের সঙ্গে নিয়ে যে কোনো পরিস্থিতি সামাল দেয়া যায়। কোনো রকম ভয় তার থাকা উচিত নয়। কিন্তু আছে। ভালই আছে। নয়ত বারবার মুখে থুথু জমত না। সেই আদিম ভয় যা যুক্তি মানে না। মনের কোন এক গহীন অন্ধকার থেকে বিড়ালের মত নিঃশব্দে বের হয়ে আসে এবং দেখতে দেখতে ফুলে-ফোঁপে বিশাল হয়ে ওঠে। গাড়ির বেগ কমে আসছে। গৌরাঙ্গের চোেখ-মুখ শক্ত। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আলম ডাকল, সাদেক সাদেক। সাদেক ভারী গলায় বলল, আমি আছি। গৌরাঙ্গ বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। আলমের কেমন বমি-বমি ভাব হচ্ছে। তার জানতে ইচ্ছা করছে অন্যদেরও তার মত হচ্ছে কি-না। কিন্তু জানার সময় নেই। গাড়ি থেমে আছে। মিলিটারিদের তাঁবু দশ-পনেরো গজ দূরে।

দরজা খুলে তিনজনই লাফিয়ে নামল। নামজুল তখনো নামেনি।

পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কুড়িজনের একটি ইউনিট ছিল ফার্মগেটে। তাদের দলপতি সুবেদার মেজর মা বুদ খা। এই দলটিকে এখানে রাখার উদ্দেশ্য মান্বুদ খাঁর কাছে পরিষ্কার নয়। এদের ওপর তেমন কোন ডিউটি নেই। মাঝে মাঝে রোড ব্লক করে যে চেকিং হয় তা করে এমপি-রা। ওদের সঙ্গে ইদানীং যোগ দিয়েছে মিলিশিয়া।

তাঁবুর ভেতরটা বেশ গরম কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশির ভাগ সৈন্যই ঘুমুচ্ছিল। বা ঘুমের ভঙ্গিতে শুয়ে ছিল। যদিও এটা ঘুমুবার সময় নয়। কিছুক্ষণের ভেতরই বৈকালিন চা আসবে। চা আসতে আজ দেরি হচ্ছে। কেন দেরি হচ্ছে কে জানে।

মাবুদ খাঁ তাবুর বাইরে চেয়ারে বসে ছিল। শুধু শুধু বসে থাকা যায় না। কিন্তু তাকিয়ে থাকা ছাড়া তার কোনো কাজ নেই। তাবুর ভেতর হৈচৈ হচ্ছে। তাস খেলা হচ্ছে সম্ভবত। এই খেলাটি তার অপছন্দ। সে মুখ বিকৃত করল এবং ঠিক তখনই সে লক্ষ্য করল তিনটি ছেলে দৌড়ে আসছে। দীর্ঘদিনের সামরিক ট্রেনিং তার পেছনে। তার বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হল না যে ছেলে তিনটি কেন ছুটে আসছে। সে মুগ্ধ হল এদের অর্বাচিন সাহসে। কিছু একটা বলল চিৎকার করে। সেটা শোনা গেল না। কারণ আকাশ কাঁপিয়ে একটা বিস্ফোরণ হয়েছে।

চিৎকার, হৈচৈ, আতংকগ্রস্ত মানুষদের ছোটাছুটি। সব কিছু ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে গুলির শব্দ। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে পড়ছে।

নূর শান্ত। সে দু'টি গ্রেনেড পরপর ছুড়েছে। এখন তার করবার কিছু নেই! সে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তির মত। চোখের সামনে যা ঘটছে তা ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। আলম ভাই দ্বিতীয় ম্যাগাজিনটি ফিট করছেন। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। এখন উচিত দ্রুত পালিয়ে যাওয়া।

যে বিকট বিস্ফোরণ হয়েছে অর্ধেক শহর নিশ্চয়ই কেঁপে উঠেছে। এয়ারপোর্ট থেকে টহলদারি জিপ নিশ্চয়ই বেরিয়ে পড়েছে।

গৌরাঙ্গ ক্রমাগত হর্ন দিচ্ছে। তার মুখ রক্তশূন্য।

নূরু চেঁচিয়ে বলল, আলম ভাই গাড়িতে উঠেন।

একটি সরকারি বাস যাত্রী নিয়ে হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে। ড্রাইভার বাস থামিয়ে হতভম্ভ হয়ে তার সিটে বসে আছে। বাসটি এমনভাবে সে রেখেছে যে গৌরাঙ্গ তার গাড়ি বের করতে পারছে না। সাদেক এগিয়ে গেল। তার হাতে স্টেইনগান। বাস ড্রাইভারকে আশ্চর্যরকম নরম গলায় বলল, ড্রাইভার সাহেব, গাড়িটা সরিয়ে নিন। আমাদের আরো কাজ আছে।

হতভম্ভ ড্রাইভার মুহূর্তে তার গাড়ি নিয়ে গেল থার্ড গিয়ারে।

ঘণ্টার শব্দ আসছে। দমকল নাকি?

ওরা গাড়িতে উঠে বসল। গৌরাঙ্গ গাড়িটিকে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আলম বলল, আস্তে যাও। আস্তে কোনো ভয় নেই।

গাড়ি যাচ্ছে ইন্টারকনের দিকে। এই প্রোগ্রামটিতে কোনো ঝামেলা নেই। কেউ গাড়ি থেকে নামবে না। ছুটে যেতে যেতে কয়েকটি গ্রেনেড ছোড়া হবে। হোটেলের বিদেশী সাংবাদিকরা জানবে ঢাকার অবস্থা স্বাভাবিক নয়। আলমের মনে হল বড় রকমের ঝামেলা হয়ত

ইন্টারকনের সামনেই অপেক্ষা করছে। যেখানে কোনো ঝামেলা হবে না। মনে করা হয়। সেখানেই ঝামেলা দেখা দেয়। আলম বলল, স্পিড কমাও গৌরাঙ্গ। করছি কি তুমি? মারবে নাকি?

গৌরাঙ্গ স্পিড কমাল। সাদেক বলল, প্রচণ্ড বাথরুম পেয়ে গেছে, কি করা যায় বল তো আলম?

আলম জবাব দিল না। ইন্টারকন এসে পড়েছে। আলমের নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এল। আবার মুখে থুথু জমছে। গা গুলাচ্ছে।

ছটায় কার্ফু শুরু হবে।

রাত্রি সাড়ে পাঁচটায় উদ্বিগ্ন হয়ে ফোন করল। ফোন ধরলেন সুরমা। তিনি বুঝতে পারছেন রাত্রির গলা কাপছে। অনেক চেষ্টা করেও সে তার উদ্বেগ চেপে রাখতে পারছে না।

তিনি নরম গলায় বললেন, কি হয়েছে রাত্রি?

কিছু হয়নি মা। তুমি কি খবর শুনেছ?

না। কী খবর?

ভিন্ন বলা যাবে না। দারুণ সব কাণ্ড হয়েছে মীরপুর রোড়ে। ফার্মগেটে। কিছু জান না?

না। জানি না।

আমরা বাড়ি আসবার জন্যে গাড়ি বের করেছিলাম। ওরা আসতে দেয়নি। রোড ব্লক করেছে। মা শোন–

শুনছি।

উনি কি এসেছেন?

না।

বল কি মা?

সুরমা চুপ করে রইলেন। রাত্রি টেলিফোন ধরে রেখেছে। যেন সে আরো কিছু শুনতে চায়। সুরমা বললেন, তোর বাবার সঙ্গে কথা বলবি?

না। মা শোন, উনি এলেই তুমি টেলিফোন করবে।

সুরমা জবাব দিলেন না।

মা।

বল শুনছি।

উনি এলেই টেলিফোন করবে। আমার খুব খারাপ লাগছে মা। আমার কাঁদতে ইচ্ছা করছে।

সুরমার মনে হল উনি কান্নার শব্দ শুনলেন। তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। কেন রাত্রি কাঁদছে? এই বয়েসী মেয়ে যদি কোনো পুরুষের কথা ভেবে কাঁদে তার ফল শুভ হয় না। বিয়ের আগে তিনি নিজেও একটি ছেলের জন্যে কাঁদতেন। তার ফল শুভ হয়নি। যদিও সেই ছেলেটির কথা তিনি একবারও ভাবেন না। তবু কোথাও যেন একটা শূন্যতা অনুভব করে। ছেলেটি তাঁর হৃদয়ের একটি অংশ খালি করে গেছে। সেখানে কোনো স্মৃতি নেই, স্বপ্ন নেই, প্রগাঢ় শূন্যতা।

সুরমা টেলিফোন নামিয়ে বসার ঘরে ঢুকবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আলম এল। তার চোখ লাল। দৃষ্টি এলোমেলো। সে সুরমার দিকে তাকিয়ে অল্প হাসল। সুরমা বললেন, তুমি ভাল আছ তো?

জি।

সবাই ভাল আছে?

হ্যাঁ, আপনি কী আমাকে একটু গরম পানি করে দিতে পারবেন? গরম পানি দিয়ে গোসল করব।

আলম ক্লান্ত পায়ে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। থমকে দাঁড়াল বারান্দায়। মতিন সাহেব বাগানে কাজ করছেন। আগাছা পরিষ্কার করে বাগানটিকে এত সুন্দর করে ফেলেছেন–শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

সুরমা গরম পানি বাথরুমে দিয়ে আলমকে খবর দিতে গেলেন। আলম হাত-পা ছড়িয়ে গভীর ঘুমে অচেতন। কাপড় ছাড়েনি। পা থেকে জুতো পর্যন্ত খুলেনি।

ঘুমের মধ্যেই আলম একটি অস্ফুট শব্দ করছে। প্রচণ্ড জ্বর হলে মানুষ এমন করে। ওর কি জ্বর? ঘরে ঢুকবার সময় দেখেছেন চোখ টকটকে লাল। সুরমা আলমের কপালে হাত রাখতেই আলম উঠে বসল।

তোমার পানি গরম হয়েছে।

থ্যাংক য়্যু।

কিন্তু তোমার গা তো পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে।

আমার এ রকম হয়। হট শাওয়ার নিয়ে শুয়ে থাকলে জ্বর নেমে যাবে।

আলম তোয়ালে টেনে নিয়ে মাতালের ভঙ্গিতে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল।

রাত্রি সন্ধ্যা সাতটায় আবার টেলিফোন করল। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, মা উনি আসেননি। তাই না?

এসেছে।

এসেছেন। তাহলে আমাকে টেলিফোন করুন কেন? আমি তখন থেকে টেলিফোনের সামনে বসে আছি।

রাত্রি ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগল। সুরমা টেলিফোনে সেই কান্না শুনলেন। তাঁর নিজেরো চোখ ভিজে উঠতে শুরু করল। তিনি নিজেও কিশোরী বয়সে এভাবে কেঁদেছেন। কেউ তার কান্না শোনেনি। তিনি টেলিফোন নামিয়ে রেখে আলমের ঘরে এলেন। আলম খাটে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। তার মুখে সিগারেট। সে সুরমাকে দেখে সিগারেট নামাল না। সুরমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার দিকে।

আলম বলল, আপনি কী কিছু বলবেন?

সুরমা থেমে থেমে বললেন, তুমি বলেছিলে এ বাড়িতে সাত দিন থাকবে। আজ সাতদিন শেষ হয়েছে।

আমি আগামীকাল চলে যাব। আগামীকাল সন্ধ্যায়।

তোমাকে কী এক কাপ চা বানিয়ে দেব?

দিন। আপনার কাছে এ্যাসপিরিন আছে?

আছে। দিচ্ছি।

বলেও সুরমা গেলেন না। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। আলম বলল, আপনি কী আরো কিছু বলবেন?

সূচিপত্র

না।

মতিন সাহেবের নাক ফুলে উঠছে বারবার। হাত মুঠিবদ্ধ হচ্ছে। কারণ বিবিসি ঢাকার গেরিলা অপারেশনের খবর ফলাও করে বলেছে। এত তাড়াতাড়ি খবর পৌঁছল। কিভাবে? সাহেবদের কর্মদক্ষতার ওপর তাঁর আস্থা সব সময়ই ছিল। এখন সেটা বহুগুণে বেড়ে গেছে।

সুরমাকে ঢুকতে দেখেই তিনি বললেন, ব্রিটিশদের মত একটা জাত আর হবে না।

সুরমা তার কথা বুঝতে পারলেন না। হঠাৎ বৃটিশ প্রসঙ্গ এল কেন কে জানে।

সুরমা, আজদাহারা ছারখার করে দিয়েছে। অর্ধেক ঢাকা শহর বার্ন করে দিয়েছে। একেবারে ছাতু। হ্যাভক।

সুরমা কিছুই বললেন না। মতিন সাহেব ট্রানজিস্টার নিয়ে শোবার ঘরে চলে গেলেন। রাত্রিকে টেলিফোন করে জানতে হবে বিবিসি শুনছে। কিনা।

টেলিফোন ধরল অপালা। সে হাই তুলে বলল, বাবা আপাকে টেলিফোন দেয়া যাবে না। তার কি জানি হয়েছে, দরজা বন্ধ করে কাঁদছে।

মতিন সাহেব অবাক হয়ে বললেন, এ রকম খুশির দিনে কাঁদছে কেন?

রাত্রি ভোরবেলাতেই চলে এসেছে

রাত্রি ভোরবেলাতেই চলে এসেছে।

সুরমা রান্নাঘরে ছিলেন। সে চলে গেল রান্নাঘরে। সুরমা মেয়েকে দেখে বিস্মিত হলেন। এ কি চেহারা হয়েছে মেয়ের! মুখ শুকিয়ে কেমন অন্য রকম দেখাচ্ছে। চোখ লাল।

তোর কী হয়েছে?

কিছু হয়নি।

ঠিক করে বল কি হয়েছে?

রাতে ঘুম হয়নি মা। সারারাত জেগে ছিলাম।

সুরমা আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। রুটি বেলতে লাগলেন। বিন্তি রুটি সেঁকছে এবং নিজের মনেই হাসছে। রাত্রি হালকা গলায় বলল, আজ কি নাশতা মা?

সুরমা কঠিন গলায় বললেন–দেখতেই পাচ্ছিস কি! জিজ্ঞেস করছিস কেন?

রাত্রি মৃদু স্বরে বলল, আমার ওপর কেন তুমি রেগে যাচ্ছ মা? আমি কী কখনো তোমাকে রাগানোর জন্যে কিছু করেছি?

সুরমা উত্তর দিলেন না। রাত্রি আবার বলল, চুপ করে থাকবে না। বল তুমি, কখনো কী তোমাকে রাগানোর মত কোনো কারণ ঘটিয়েছি?

সুরমা দেখলেন রাত্রির চোখে জল টলমল করছে। যেন এক্ষুণি সে কেঁদে ফেলবে। তাঁর নিজেরো কান্না পেয়ে গেল। তিনি মনে মনে বললেন, কেউ যেন আমার এই মেয়েটির মনে কষ্ট না দেয়। বড় ভাল মেয়ে। বড় ভাল।

রাত্রি।

কি মা। আলমের ঘুম ভেঙেছে কিনা দেখে আয়।

বলেই সুরমা পাংশুবর্ণ হয়ে গেলেন। কেন রাত্রিকে এই কথা বললেন? তিনি ভালই জানেন আলম জেগে আছে। কিছুক্ষণ আগেই তিনি তাকে চা দিয়ে এসেছেন। রাত্রিকে এ কথা বলার উদ্দেশ্য কি এই যে তিনি তাকে খুশি করতে চেয়েছেন? কী ভয়ানক কথা! রাত্রি কি তার এই উদ্দেশ্য ধরতে পেরেছে? নিশ্চয়ই পেরেছে। সে বোকা মেয়ে নয়। নিজেকে সামলানোর জন্য তিনি থেমে থেমে বললেন–

আজ চলে যাবে। একটু যত্ন-টত্ন করা দরকার।

আজ চলে যাবেন নাকি?

হ্যাঁ। এক সপ্তাহ থাকার জন্যে এসেছিল। এক সপ্তাহ তো হয়ে গেল।

তিনি কি বলছেন। আজ চলে যাবেন?

হ্যাঁ বলেছেন।

রাত্রি হালকা পায়ে ঘর ছেড়ে গেল। তার গায়ে একটা ধবধবে সাদা সিল্কের শাড়ি। শাড়িতে বেগুনি ফুল। কি চমৎকার লাগছে রাত্রিকে। তাঁর মনে হল শুধুমাত্র মেয়েরাই সৌন্দর্য বুঝতে পারে। পুরুষরা পারে না। ওদের নজর থাকে শরীরের দিকে। সৌন্দর্য দেখবার সময় কোথায় ওদের।

আলম পা ঝুলিয়ে খাটে বসে আছে। তার কোলের উপর একটি বই। সে পা দুলাচ্ছে। রাত্রিকে ঢুকতে দেখে সে অল্প হাসল।

কখন এসেছেন?

এই তো কিছুক্ষণ আগে।

কী বই পড়ছেন এত মন দিয়ে?

আলম একটু উঁচু করে দেখাল 'দত্তা'। রাত্রি হাসিমুখে বলল, অপালা এই বইটা মুখস্থ বলতে পারে। পাঁচ ছদিন পর পর এই বইটা সে একবার পড়ে ফেলে।

আলম বলল, আপনি কি অসুস্থ? কেমন যেন অন্য রকম লাগছে।

না, অসুস্থ না। আমি বেশ ভাল। দেখতে এসেছি আপনি কেমন আছেন। কাল সন্ধ্যাবেলা যা ভয় পেয়েছিলাম। কেন জানি মনে হচ্ছিল কিছু একটা হয়েছে আপনার। কি যে কষ্ট হচ্ছিল। আপনি কোনোদিন কল্পনাও করতে পারবেন না।

আলমের অস্বস্তি লাগছে। এসব কি বলছে এই মেয়ে? কিন্তু এ তো সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলছে। আলম কথা ঘুরাবার জন্য বলল, কাল কি হয়েছে শুনতে চান?

না শুনতে চাই না। যুদ্ধ-টুদ্ধ আমার ভাল লাগে না।

কারোরই ভাল লাগে না।

রাত্রি খাটে আলমের মত পা ঝুলিয়ে বসল। মিষ্টি একটা গন্ধ বাতাসে ভাসছে। সৌরভ। কি মানুষের মনে বিষাদ জাগিয়ে তুলে? তুলে বোধ হয়। আলমের কেমন জানি মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

রাত্রি বলল, আপনি নাকি আজ চলে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

কখন যাবেন?

বিকালে।

আপনি কি ঢাকাতেই থাকবেন, না চলে যাবেন অন্য কোথাও?

ঢাকাতেই থাকব।

আর আসবেন না আমাদের এখানে?

আসব না কেন, আসব।

আমার মনে হচ্ছে আপনি আর আসবেন না।

এ রকম মনে হচ্ছে কেন?

কেউ কথা রাখে না।

রাত্রি হঠাৎ উঠে চলে গেল। কারণ তার চোখ চলে ভরে আসছে। এই জল একান্তই নিজের, লুকিয়ে রাখার জিনিস। সে চলে গেল তার নিজের ঘরে।

অপালা সেখানে বসে আছে। তার হাতে একটা গল্পের বই। সে বই নামিয়ে বলল, কাদছ কেন আপা?

মাথা ধরেছে।

অপালা চোখ নামিয়ে নিল বইয়ে। সে নিজেও কাঁদছে। কারণ এই মুহূর্তে সে খুবই দুঃখের একটা ব্যাপার পড়ছে। নায়িকা সিঁড়ি থেকে পিছলে পড়েছে এবং চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে

না। সে আর্তস্বরে চিৎকার করছে।–অরুণ! অরুণ! সে ডাক শুনেও নির্বিকার ভঙ্গিতে নেমে যাচ্ছে।

সুরমা নাস্তা টেবিলে দিয়ে আলমকে ডাকতে এলেন। আলম জুতো পরছে।

কোথাও বেরুচ্ছ?

জি।

কখন ফিরবে?

বিকেলে এসে বিদায় নিয়ে যাব।

সুরমা একবার ভাবলেন বলেন, মাঝে মাঝে এসো। কিন্তু বলতে পারলেন না। যেসব কথা আমরা বলতে চাই তার বেশির ভাগই আমরা বলতে পারি না।

নাশতা খেতে আস বাবা।

আসছি।

মতিন সাহেব ঢাকা রেডিও খুলে বসেছিলেন। বাচ্চাদের একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে। কিচিরমিচির করছে একদল বাচা।

আপা, আমি একটা ছড়া বলব। আমার নাম রুমান ময়না। ময়না কোন কথা কয় না...

বাহ বাহ বেশ হয়েছে। এবার তুমি আস। পরিষ্কার করে নাম বল।

আপা, আমার নাম সুমন, আমি একটা গান গাইব। রচনা বিদ্রোহী কবি নজরুল– কাবেরী নদীজলে কে গো বালিকা...

চমৎকার হয়েছে। এবার তুমি আস।

মতিন সাহেব বিড়বিড় করে বললেন... এদের ধরে চাবকান উচিত। এ সময় গান গাচ্ছে, ছড়া বলছে, কতবড় স্পর্ধা!

সুরমা এসে বললেন, নাশতা দেয়া হয়েছে। খেতে আস।

মতিন সাহেব শিশুর মত রেগে গেলেন।

যাও, আমি খাব না কিছু। যত ইডিয়টের দল। গান গাইছে, ছড়া বলছে। চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দিতে হয়।

শরীফ সাহেব আলমকে দেখে মোটেই অবাক হলেন না। তার ভঙ্গি দেখে মনে হল তিনি যেন মনে মনে তার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

মামা কি খবর তোমার?

ভাল। তুই এখনো বেঁচে আছিস?

আছি।

কাল রাতে স্বপ্নে দেখলাম গুলি খেয়েছিস; তখনি বুঝলাম তুই ভাল আছিস। আমার স্বপ্ন সব সময় উল্টো হয়।

শরীফ সাহেব কোমরের লুঙ্গি আঁট করতে করতে উঠে দাঁড়ালেন। নটা বাজে। অফিসে যাবার জন্য তৈরি হতে হয়। কিন্তু কেন যেন অফিসে যেতে ইচ্ছা করছে না। লুঙ্গী বদলে প্যান্ট পরতে হবে ভাবতেই খারাপ লাগছে।

চা খাবি?

না।

কফি। কফি খাবি? একটা ইনসটেন্ট কফি কিনেছি। চা বানানোর মহা হাঙ্গামা। কাজের ছেলেটা আমার একটা সুটকেস নিয়ে পালিয়ে গেছে।

বলতে বলতে তাঁর হাসি পেয়ে গেল। কারণ সুটকেসটিতে কিছু পুরনো ম্যাগাজিন ছাড়া কিছু ছিল না। ছাত্র জীবনে কিছু গল্প কবিতা লিখতেন। তার কয়েকটি ছাপাও হয়েছিল। সুটকেস বোঝাই সেই সব ম্যাগাজিনে। ·

হাসছ কেন?

ব্যাটা খুব ঠক খেয়েছে। সুটকেস খুলে হাউমাই করে কাঁদবে।

আলমের মনে হল, তার মামার হাসির ভঙ্গিটি কেমন যেন অস্বভাবিক। সুস্থ মানুষের হাসি নয়। অসুস্থ মানুষের হাসি।

আলম।

বল।

তোর চিঠি তোর মাকে পৌঁছে দিয়েছি।

মা ভাল আছেন?

জানি না।

জানি না মানে?

দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

ভাল করেছ। ভাবছি নিজেও চলে যাব। রাতে ঘুম হয় না।

যাও, চলে যাও।

কিন্তু ওরা খুঁজে বের করে ফেলবে। ফখরুদ্দীন সাহেব পালিয়ে গিয়েছিলেন। মানিকগঞ্জ তার শ্বশুরবাড়ি থেকে ধরে নিয়ে এসেছে। এখন বোধ হয় মেরেই ফেলেছে। খাবি তুই কফি?

দাও।

ফার্মগেটের অপারেশনে তুই ছিলি?

হুঁ।

ভালই দেখিয়েছিস।

আলম হাসল। হাসিমুখে বলল, তোমার সামনে সিগারেট খেলে তুমি রাগ করবে?

খেতে ইচ্ছা হলে খা। লায়েক হয়ে গেছিস, এখন তো খাবিই।

কফি ভাল হল না। অতিরিক্ত কড়া হয়ে গেল। হালকা করার জন্য দুধ ও গরম পানি মেশানোর পর তার স্বাদ হল আরো কুৎসিত। শরীফ সাহেব খুব বিকৃত করে বললেন, পেচ্ছাবের মত লাগছে। ফেলে দে। আবার বানাব।

আর বানাতে হবে না। মামা একটা কথা শোন।

বল, শুনছি।

আমি যদি তোমার এখানে থাকি কয়েকদিন তোমার অসুবিধা হবে?

না। আগে যেখানে ছিলি সেখানে কি অবস্থা? জানাজানি হয়ে গেছে?

তা না। ভদ্রমহিলা একটু ভয় পাচ্ছেন। তাছাড়া আমি বলেছিলাম এক সপ্তাহ থাকিব। এক সপ্তাহ হয়ে গেছে।

কখন আসবি?

বিকেলে। আমাকে একটা চাবি দাও।

শরীফ সাহেব চাবি বের করে দিলেন। এবং দ্রুত কাপড় পরতে শুরু করলেন। আলম এখানে থাকলে অফিস মিস করা উচিত হবে না।

আলম।

বল মামা।

একটা সাকসেসফুল অপারেশনের পর ওভার কনফিডেন্ট হবার একটা সম্ভাবনা থাকে। খুব সাবধান। এরা এখন পাগলা কুত্তার মত। দারুণ সতর্ক। পাগলা কুত্তারা খুব সতর্ক হয় জানিস তো?

আমরাও সতর্ক।

স্বপ্ন দেখে মনটা একটু ইয়ে হয়ে গেল। যদিও জানি আমার স্বপ্ন সব সময় উল্টো হয়। প্রমোশন পাওয়ার একটা স্বপ্ন দেখলাম একবার, হয়ে গেল ডিমোশন। অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি বানিয়ে বেইজ্জত করল।

শরীফ সাহেব। আবার হাসতে শুরু করলেন। অন্য রকম হাসি। অসুস্থ মানুষের হাসি।

বুঝলি আলম, এই যুদ্ধ দীর্ঘদিন চলবে। মে বি ফর ইয়ারস। চায়না কেমন চুপ মেরে আছে দেখছিস না? অন্য দেশগুলি চুপ করে আছে আমি মাইন্ড করছি না, কিন্তু চায়না পাকিস্তান সমর্থন করবে। কেন? হোয়াই? মানুষের জন্য মমতা নেই চায়নার এটা ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। হোয়াই চায়না? হোয়াই?

অফিসে যাবে না। মামা?

না ইচ্ছা করছে না। শুয়ে থাকব। সিক রিপোর্ট করব। আসলেই সিক সিক লাগছে। দেখ তো কপালে জ্বর আছে কিনা।

জ্বর নেই।

না থাকলেও হবে। জ্বর হবে, সর্দি হবে, কাশি হবে। ডায়েরিয়া হবে।

শরীফ সাহেব শব্দ করে হাসতে লাগলেন। গা দুলিয়ে হাসি।

ঝিকাতলার একটি বাসায় সবাই একত্র হয়েছে। রহমানও আছে। সে এখন মোটামুটি সুস্থ। জ্বর নেমে গেছে। দাড়ি-গোঁফ কামানোয় তাকে বালক-বালক লাগছে। পরবর্তী অপারেশন নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। নতুন মানুষের ভেতর মিনহাজ উদ্দিনকে দেখা যাচ্ছে। তার কাছ থেকেই জানা গেল। আরো কিছু ছোট ছোট গ্রুপ শহরে ঢুকেছে। এরা পাওয়ার স্টেশন নষ্ট করতে চেষ্টা করবে। ট্রান্সফরমার উড়িয়ে দেয়ার কাজটা বাইরে থেকে বোমা মেরে করা যাবে না। সাহায্য আসতে হবে ভেতর থেকে। প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে।

সাহায্য করতে সবাই আগ্রহী। কিন্তু সবাইকে দিয়ে এ কাজ হবে বা। ঠিক লোকটিকে বেছে নিতে হবে। সাহসী এবং বুদ্ধিমান একজন মানুষ। মুশকিল হচ্ছে–এই দু'টি জিনিস খুব কম সময়ই একত্রে পাওয়া যায়। সাধারণত সাহসী লোকদের বুদ্ধি কম থাকে। মিনহাজ সাহেব বললেন, আলম সাহেব, আপনারা যা করছেন এটা হচ্ছে হিরোইজম। ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের বীরত্বের দরকার নেই; আমরা এখন চাই ওদের বিরক্ত করতে। বোমা ফাটিয়ে, গ্রেনেড ফাটিয়ে নার্ভাস করে ফেলতে। বুঝতে পারছেন?

পারছি।

কথাগুলি কিন্তু আমার না। কমান্ড কাউন্সিলের।

তাও জানি।

এমন সব জায়গায় যান। যেখানে মিলিটারি নেই। সরাসরি সংঘর্ষের সম্ভাবনা নেই। যেমন ধরুন, পেট্রল পাম্প। পেট্রল পাম্প উড়িয়ে দিন। দর্শনীয় ব্যাপার হবে।

আলম হাই তুলল। মিনহাজ সাহেব একজন বিরক্তিকর মানুষ। কথা বলে মাথার পোকা নড়িয়ে দেয়। একই কথা একশ বার বলে।

আলম সাহেব।

বলুন শুনছি।

আজ আপনাদের কি প্রোগ্রাম?

আছে কিছু।

বলুন শুনি।

বলার মত কিছু না।

মিনহাজ সাহেব মুখ কালো কবে ফেললেন। এত অল্পতে মানুষ এমন আহত হয় কেন আলম ভেবে পেল না। মিনহাজ সাহেবেব অন্য দল; তাদের সঙ্গে এ দলের কাজকর্মের আলোচনার কি তেমন কোনো দরকার আছে? কোন দরকার নেই।

আশফাক তার পিকআপ নিয়ে উপস্থিত হল দুটার সময়। তার সঙ্গে সাদেক।

আশফাক দাঁত বের করে বলল, নিজের গাড়িই আনলাম। নিজের জিনিস ছাড়া কনফিডেন্স পাওয়া যায় না।

আলম বিরক্ত হয়ে বলল, একই গাড়ি নিয়ে দিতীয়বার বের হতে চাই না।

সাদেক নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, ঢাকা শহরে এ রকম পিক-আপ পাঁচ হাজার আছে। তুই ভ্যাজর ভ্যাজর করিস না, উঠে আয়। রোজ একটা করে নতুন গাড়ি পাব কোথায়? ছোট কাজ চট করে সেরে চলে আসব। সবার যাওয়ার দরকার নেই।

গাড়িতে উঠল তিনজন। ড্রাইভারের পাশে আলম। পেছনের সিটে নুরু এবং সাদেক। তারা চলে গেল মগবাজারের একটা পেট্রল পাম্পে। জায়গাটা খারাপ না। ওয়ারলেস স্টেশনের কাছে। ঠিকমত বিস্ফোরণ ঘটাতে পারলে পাকিস্তানিদের বড় ধরনের একটা চমক দেওয়া যাবে।

সবাই বসে রইল পিক-আপে। লম্বা লম্বা পা ফেলে নেমে গোল সাদেক। যেতে যেতে শীস দিচ্ছে।

কাচের ঘরের ভেতর যে গোলগাল লোকটি বসে ছিল, তাকে হাসিমুখে বলল, মন দিয়ে শুনেন কি বলছি। আমরা আপনার এই পেট্রল পাম্পটা উড়িয়ে দেব। আপনি লোকজন নিয়ে সরে পড়ুন। কুইক।

লোকটি চোখের পাতা পর্যন্ত ফেলতে ভুলে গেল। তাকিয়ে রইল মাছের মত। সাদেক বলল, আমার কথা বুঝতে পারছেন তো?

জি পারছি।

তাহলে দেরি করছেন কেন?

আপনারা মুক্তিবাহিনী?

হ্যাঁ!

লোকটি হাসের মত ফ্যাসফ্যাস গলায় ডাকতে লাগল হিসামুদ্দিন, হিসামুদ্দিন ও হিসামুদ্দিন!

বিস্ফোরণ হল ভয়াবহ। বিশাল আগুন দাউদাউ করে আকাশ স্পর্শ করল। বিকট শব্দ হতে থাকল। কুণ্ডুলী পাকিয়ে উঠছে কালো ধোঁয়া। অসংখ্য লোকজন ছোটাছুটি করছে। চিৎকার। হৈচৈ। হিসহিস শব্দ হচ্ছে। ভয়াবহ ব্যাপার!

আশফাকের পিকআপ ছুটে চলছে। নূরু ফিসফিস করে বলল, পেট্রল পাম্পে গ্রেনেড না ছোড়াই ভাল। এই অবস্থা হবে কে জানত।

ঘণ্টা বাজিয়ে চারদিক থেকে ফায়ার ব্রিগেড আসছে। বিস্ফোরণে যারা ভয় পায়নি তারা এবার ভয় পাবে। ফায়ার ব্রিগেডের ঘণ্টা অতি সাহসী মানুষের মনেও আতংক ধরিয়ে দেয়।

আলম হঠাৎ করে লক্ষ্য করল পেছন থেকে দৈত্যাকৃতি একটি ট্রাক দুটে আসছে। অনুসন্ধানী ট্রাক। বিস্ফোরণের রহস্যের সন্ধান করছে নিশ্চয়ই। ট্রাকের মাথায় দু'টি

মেশিনগান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন গানার। এরা কি তাদের পিক-আপ থামাবে এবং বলবে–তোমরা কারা? কোথায় যাচছ? বের হয়ে আস। হাত মাথার উপর তোল।

আলমের মাথা ঝিমঝিম করছে। পেটের ভেতর কি জানি পাক খাচ্ছে। এই ট্রাক ওদের থামাবে। নিশ্চয়ই থামাবে। বোঝা যায়। কিছু কিছু জিনিস টের পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ সময়ে দুষ্ক সেন্স কাজ করে। আলম ফিসফিস করে বলল আশফাক সাইড দাও। মাথা ঠাণ্ডা রাখ সবাই।

আশফাক গাড়ি প্রায় ফুটপাতের উপর তুলে ফেলল। ট্রাক থামল না। গানার দু'জন পলকের জন্যে তাকাল তাদের দিকে। ওদের চোখ কাচের মত ঠাণ্ডা।

সাদেক কপালের ঘাম মুছে বলল, একটা বড় ফাঁড়া কাটা গেছে। আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল এরা আমাদের জন্যেই এসেছে। আলম, তোর কি এরকম মনে হয়েছে?

আলম জবাব দিল না। সাদেক বলল, কেন জানি দারুণ একটা ভয় লেগে গেল। আমার কখনো এ রকম হয় না। মরার ভয় আমার নেই।

আশফাক সিগারেট ধরিয়েছে। সে বেশ সহজ স্বাভাবিক। সিগারেটে টান দিয়ে একসিলেটরে চাপ দিয়ে হালকা গলায় বলল, চলেন ঘরে ফিরে যাই।

নিউ ইস্কাটনের কাছে এসে তাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। সেই ট্রাকটি দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে তাদের দিকে মুখ করে। গানার দু'জন মেশিনগান তাক করে আছে। কিছু

সৈন্য নেমে এসেছে রাস্তায়। তাদের একজন মাঝ রাস্তায় চলে এসেছে। বাঁশি বাজাচ্ছে এবং গাড়ি থামাতে বলছে। এর মানে কি?

আলম ফিসফিস করে বলল, আশফাক, কেটে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করা। নূরু, দেখ কিছু করতে পার কিনা।

ওরা বন্দুক তাক করছে। বুঝে ফেলেছে। এ গাড়ি থামবে না। সাদেক স্টেনগানের মুখ গাড়ির জানালায় রাখল। নূরু দু'টি গ্রেনেডের পিন খুলে হাত নিয়ে বসে আছে। সাত সেকেন্ড সময় আছে। সাত সেকেন্ড অনেক সময়। কিছুক্ষণ হাতে নিয়ে বসে থাকা যায়।

আশফাকের গাড়ি লাফিয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে উড়ে চলে যাবে। নূরু দু'টি গ্রেনেডই ছুড়েছে। বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়ার আগেই ওদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে পড়ল। আলম নিজের স্টেনগানের উপর ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলল–মাথা ঠাণ্ডা রাখ, মাথা ঠাণ্ডা।

শরীফ সাহেব বাড়ি ফিরবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। তখন খবরটা পেলেন। মিলিটারিদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ হয়েছে গেরিলাদের। গেরিলাদের কিছুই হয়নি। কিন্তু মিলিটারিদের একটা ট্রাক উড়ে গেছে। এ জাতীয় খবর কখনো পুরোপুরি সত্যি হয় না। উইসফুল থিংকিংয়ের একটা ব্যাপার আছে। বাস্তবে নিশ্চয়ই অন্যরকম কিছু হয়েছে। গেরিলাদের গায়ে আঁচড়ও পড়বে না তা কি হয়!

শরীফ সাহেব খুব আশা করতে লাগলেন যেন সংঘর্ষের খবরটা সত্যি না হয়। সত্যি না হবার কথা। দিনে দুপুরে ওরা কি মিলিটারিদের ওপর ঝাপিয়ে পড়বে? অবশ্যি পড়তেও পারে। রোমান্টিসিজম! ওদের যা বয়স তাতে রোমান্টিসিজমই প্রাধান্য পাবে। এ জাতীয় অপারেশনে আসা উচিত মধ্য বয়স্কদের। যারা সাবধানী।

তিনি বাড়ি ফিরে কাপড় না ছেড়েই বারান্দার ইজি চেয়ারে বসে রইলেন। আলমের জন্যে অপেক্ষা। সে আসছে না; দেরি করছে কেন? খোঁজখবর নেবারও কোনো উপায় নেই। কে কোথায় থাকে তার জানা নেই। সাবধানতা! যেখানে ওদের সাবধানী হওয়া উচিত। সেখানে না হয়ে অন্য জায়গায়। কোন মানে হয়?

দুপুর তিনটায় নিয়ামত সাহেব টেলিফোন করলেন।

খবর শুনছেন? ভেরি অথেনটিক।

কি খবর?

গেরিলাদের একটা পিকআপ ধরা পড়েছে। দুজনের ডেড বডি পাওয়া গেছে।

কে বলেছে আপনাকে? যত উড়ো খবর। এইসব খবরে কান দেবেন না। এবং টেলিফোনে এসব ডিসকাসও করবেন না।

শরীফ সাহেব টেলিফোন নামিয়ে আবার বারান্দায় এসে বসলেন।

মতিন সাহেব অবাক হয়ে দেখলেন একটা বেবি টেক্সি এসে তার বাড়ির সামনে থেমেছে। বেবি টেক্সি ড্রাইভার এবং একটি অচেনা লোক আলমকে ধরাধরি করে নামাচ্ছে। তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন, কি হয়েছে? অপরিচিত লম্বা ছেলেটি বলল, গুলি লেগেছে। আপনারা রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করুন। আমি ডাক্তার নিয়ে আসব। আমার নাম আশফাক। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। এসে ধরুন।

তারা বসার ঘরে ঢুকল। আলমের জ্ঞান আছে। সে হাত দিয়ে বাঁ কাঁধ চেপে ধরে আছে। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে সেখান থেকে।

রাত্রি এসে দাঁড়িয়েছে। দরজার পাশে। তার মুখ রক্তশূন্য। সে একটি কথাও বলছে না। মতিন সাহেব ভাঙা গলায় বললেন, মা একে ধর। রাত্রি নড়ল না। যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। সেভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

ভেতর থেকে সেলাই মেশিনের শব্দ হচ্ছে। আশফাক শান্ত স্বরে বলল, আলম ভাই, আপনি কোনো রকম চিন্তা করবেন না। কারফিউয়ের আগেই আমি ডাক্তারের ব্যবস্থা করব। যেভাবেই হোক।

বেবিটেক্সির বুড়ো ড্রাইভারটির মুখ ভাবলেশহীন। যেন এ জাতীয় ঘটনা সে জীবনে বহু দেখেছে।

আশফাক তার ঘরে পৌঁছল পাঁচটায়। এখান থেকে সে যাবে ঝিকাতলা। ওদের খবর দিয়ে ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে হবে। কার্য্য শুরু হয়ে যাবে সাড়ে ছটায়। হাতে অনেকখানি সময়।

সে গেঞ্জি বদলে একটা শার্ট পরল। অভ্যাস বসে চুল আচড়াল, নিচে নামল। গালে ক্রিম দিল। মুখের চামড়া টানছে। এসব শীতকালে হয়। চামড়া শুকিয়ে যায়। কিন্তু তার এখন হচ্ছে কেন? বড়ড ক্লান্ত লাগছে। নিচে নামতে গিয়ে পা কাপছে। কেন এ রকম হচ্ছে? সে এখনো বেঁচে আছে। বিরাট ঘটনা। আনন্দে চিৎকার করা উচিত। কিন্তু আনন্দ হচ্ছে না। কেমন যেন ঘুম ◌lgbছ।

তার জন্যে কালো রঙের জিপ নিয়ে আমি ইন্টেলিজেন্সের লোকজন অপেক্ষা করছে।

আশফাক তোমার নাম?

হ্যাঁ!

চল আমাদের সঙ্গে; তোমার জন্য গত এক ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি।

জোনাকি

রাত্রি পাথরের মূর্তির মত একা একা বসার ঘরে বসে আছে। দুপুর থেকেই আকাশ মেঘে মেঘে কালো হয়েছিল। এখন বৃষ্টি নামল। প্রবল বর্ষণ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঘনঘন বাজ পড়ছে।

রাস্তায় লোক চলাচল একেবারেই নেই। দু'একটা রিকশা বা বেবিটেক্সির শব্দ শোনামাত্র রাত্রি বের হয়ে আসছে। বোধ হয় ডাক্তার নিয়ে কেউ এসেছে। না কেউ না। কার্য্যর সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণ পর হয়ত একটি রিকশা বা বেবিটেক্সির শব্দ কানে আসবে না। দ্রুতগামী জিপ কিংবা ভারী ট্রাকের শব্দ কানে আসবে। রাত্রি ঘড়ি দেখে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সামনের পুকুরে এই অবেলায় একজন লোক গোসল করছে। কোথাও কেউ নেই। এমন ঘোর বর্ষণ-এর ভেতর নিজের মনে লোকটা সাঁতার কাটছে। দেখে মনে হচ্ছে এই লোকটির মনে কত আনন্দ।

জামগাছওয়ালা বাড়ির উকিল সাহেব বাজার নিয়ে ফিরছিলেন। তার এক হাতে ছাতি, তবু তিনি পুরোপুরি ভিজে গেছেন। তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে রাত্রিকে দেখলেন। অবাক হয়ে বুললেন, একা একা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছ কেন মা? ভেতরে যাও। কখনো বারান্দায় থাকবে না। যাও যাও, ভেতরে যাও। দরজা বন্ধ করে দাও।

রাত্রি বলল, কার্ফু কি শুরু হয়েছে চাচা?

না, এখনো ঘণ্টা খানিক আছে। যাও মা, ভেতরে যাও।

উকিল সাহেব লম্বা লম্বা পা ফেলে এগুলেন। তার এক মেয়ে যুথী রাত্রির সঙ্গে পড়ত। মেট্রিক পাস করবার পরই তার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের এক বছরের মাথায় বাচ্চা হতে গিয়ে যুথী মারা গেল। বিয়ে না হলে মেয়েটা বেঁচে থাকত। মেয়েদের জীবন বড় কষ্টের।

লোকটা পুকুরে এখনো সাঁতার কাটছে। চিৎ হয়ে, কাত্ত হয়ে নানান রকম ভঙ্গি করছে। পাগল নাকি?

ভেতর থেকে সুরমা ডাকলেন–রাত্রি!

রাত্রি জবাব দিল না। সুরমা বারান্দায় এসে তার মেয়ের মতই অবাক হয়ে সাঁতার কাটা লোকটিকে দেখতে লাগলেন। রাত্রি মৃদু স্বরে বলল, কেউ তো এখনো এল না মা। সুরমা শান্ত গলায় বললেন, এসে পড়বে। এখনি এসে পড়বে। তুই ভেতরে আয়। আলমের কাছে গিয়ে বস।

রাত্রি বসার ঘরে এসে সোফায় বসল। ভেতরে গেল না। ভেতরে যেতে তার ইচ্ছা করছে না। মতিন সাহেব একটা পরিষ্কার পুরনো শাড়ি ভাঁজ করে আলমের কাধে দিয়েছেন। তিনি দুহাতে সেই শাড়ি চেপে ধরে আছেন। একটু পরপর ফিসফিস করে বলছেন, তোমার কোনো ভয় নাই। এক্ষুণি ডাক্তার চলে আসবে। তাছাড়া রক্ত বন্ধ হওয়াটাই বড় কথা। রক্ত বন্ধ হয়েছে।

মতিন সাহেবের কথা সত্যি নয়। কাঁধের শাড়ি ভিজে উঠেছে। রক্ত জমাট বাঁধছে না। আলম নিঃশ্বাস নিচ্ছে হা করে। মাঝে মাঝে খুব অস্পষ্টভাবে আহ-উহ করছে। কিন্তু জ্ঞান আছে পরিষ্কার। কেউ কিছু বললে জবাব দিচ্ছে। সে একটু পরপর পানি খেতে চাইছে।

চামচে করে মুখে পানি দিচ্ছে বিন্তি। এই প্রথম বিন্তির মুখে কোনো হাসি দেখা যাচ্ছে না। সে পানির গ্লাস এবং চামচ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাশে। তার সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অপালা। সে দারুণ ভয় পেয়েছে। একটু পরপর কেঁপে উঠছে! এক সময় আলম গোঙাতে শুরু করল। অপালা চমকে উঠল। তারপরই কেঁদে উঠে ছুটে বের হয়ে গেল।

রাত্রি এসে দাঁড়িয়েছে। দরজার ওপাশে। তার মুখ ভাবলেশহীন। সে তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে।

আলম কাৎরাতে কাৎরাতে বলল, ব্যথাটা সহ্য করতে পারছি না। একেবারেই সহ্য করতে পারছি না।

মতিন সাহেব তাকিয়ে আছেন। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, ডাক্তার এসে পড়বে। একটু ধৈর্য ধর। একটু। রাত্রি, তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কিছু একটা কর।

কি করব বল?

মতিন সাহেব কিছু বলতে পারলেন না।

বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। খোলা জানালা দিয়ে প্রচুর হাওয়া আসছে। বৃষ্টি ভেজা হাওয়া।

জানালা বন্ধ করে দে।

রাত্রি জানালা বন্ধ করবার জন্য এগিয়ে যেতেই আলম বলল, বন্ধ করবেন না। প্লিজ, বন্ধ করবেন না। সে পাশ ফিরতে চেষ্টা করতেই তীব্র ব্যথায় সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে গেল। মাকে ডাকতে ইচ্ছা করছে। ব্যাথার সময় মা মা বলে চিৎকার করলেই ব্যথা কমে যায়। এটা কি সত্যি, না। একটা সুন্দর একটা কল্পনা?

খোলা জানালার পাশে রাত্রি দাঁড়িয়ে আছে। হাওয়ায় তার চুল উড়ছে। আহ কি সুন্দর দেখাচ্ছে মেয়েটাকে! বেঁচে থাকার মত আনন্দ আর কিছুই নেই। কত অপূর্ব সব দৃশ্য চারদিকে। মন দিয়ে আমরা কখনো তা দেখি না। যখন সময় শেষ হয়ে যায় তখনি শুধু হাহাকারে হৃদয় পূর্ণ হয়। রাত্রি কি যেন বলছে। কি বলছে সে? আলম তার ইন্দ্রিয়গুলি সজাগ করতে চেষ্টা করল।

আপনি বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছেন। জানালা বন্ধ করে দি?

না না। খোলা থাকুক প্লিজ।

এই জানালা বন্ধ করা নিয়ে কত কাণ্ড হত বাড়িতে। শীতের সময়ও জানালা খোলা না রেখে সে ঘুমুতে পারত না। মা গভীর রাতে চুপিচুপি এসে জানালা বন্ধ করে দিতেন। এ নিয়ে তার কত ঝগড়া।

নিউমোনিয়া হয়ে মরে থাকবি একদিন।

জানালা বন্ধ থাকলে নিউমোনিয়া ছাড়াই মরে যাব মা। অক্সিজেনের অভাবে মরে যাব।

অন্য কারো তো অক্সিজেনের অভাব হচ্ছে না।

আমার হয়। আমি খুব স্পেশাল মানুষ তো তাই।

সেই খোলা জানালা দিয়ে চোর এল এক রাতে। আলমের টেবিলের উপর থেকে মানিব্যাগ, ঘড়ি এবং একটা ক্যামেরা নিয়ে পাইপ বেয়ে নেমে গোল। সকালবেলা দেখা গেলা–চোর তার স্পঞ্জের স্যান্ডেল বাগানে ফেলে গেছে। আলম সেই স্যান্ডেল জোড়া নিয়ে এল। হাসিমুখে মাকে বলল, শোধ-বোধ হয়ে গেল মা। চোর নিয়েছে আমার জিনিস, আমি নিলাম চোরের। এখন থেকে এই স্যান্ডেল আমি ব্যবহার করব।

এই নিয়ে মা বড় ঝামেলা করতে লাগলেন। চিৎকার চেঁচামেচি। চোরের স্যান্ডেল ঘরে থাকবে কেন? এসব কি কাণ্ড? আলম হোসে হেসে বলত, বড় সফট স্যান্ডেল মা। পরতে খুব আরাম।

স্যাণ্ডেল জোড়া কি আছে এখনো? মানুষের মন এত অদ্ভুত কেন? এত জিনিস থাকতে আজ মনে পড়ছে চোরের স্যাণ্ডেল জোড়ার কথা?

মতিন সাহেব। ঘড়ি দেখলেন। কারফিউয়ের সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। ছেলেটি কি ডাক্তার নিয়ে আসবে না? তার নিজেরই কি যাওয়া উচিত? আশপাশে ডাক্তার কে আছেন? একজন লেডি ডাক্তার এই পাড়াতে থাকেন। তার বাড়ি তিনি চেনেন না। কিন্তু খুঁজে বের করা যাবে। সেটা কি ঠিক হবে? গুলি খেয়ে একটি ছেলে পড়ে আছে। এটা জানাজানি করার বিষয় নয়। কিন্তু ছেলেটার যদি কিছু হয়? বৃষ্টি-বাদলার জন্যেই অসময়ে চারদিক

অন্ধকার হয়ে গেছে। ইলেকট্রিসিটি নেই। এ অঞ্চলে অল্প হাওয়া দিলেই ইলেকট্রিসিটি চলে যায়। মতিন সাহেব বললেন, একটা হারিকেন নিয়ে আয় তো মা।

রাত্রি ঘর থেকে বেরুবামাত্র আলম দুইবার ফিসফিস করে তার মাকে ডাকল–আম্মি আম্মি। শিশুদের ডাক। যেন একটি নয়-দশ বছরের শিশু অন্ধকারে ভয় পেয়ে তার মাকে ডাকছে। রাত্রি নিঃশব্দে এগুচ্ছে রান্নাঘরের দিকে। শোবার ঘর থেকে অপালা ডাকল, আপা, একটু শুনে যাও।

অপালা বিছানার চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে। অসম্ভব ভয় লাগছে তার। সে চাদরের নিচে বারবার কোপে কেঁপে উঠছে। রাত্রি ঘরে ঢোকামাত্রই সে উঠে বসল।

কি হয়েছে অপালা?

খুব ভয় লাগছে।

মার কাছে গিয়ে বসে থাক।

অপালা আবার চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। রাত্রি এসে হাত রাখল। তার মাথায়। গা গরম। জ্বর এসেছে।

অপালা ফিসফিস করে বলল, আপা উনি কি মারা গেছেন?

না, মারা যাবেন কেন? ভাল আছেন।

তাহলে কোনো কথাবার্তা শুনছি না কেন?

রাত্রি কোনো জবাব দিল না। অপালা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, তুমি একটু আমার পাশে বসে। থাক আপা। রাত্রি বসল। ঠিক তখনি শুনতে পেল আলম আবার তার মাকে ডাকছে আমি আম্মি।

রাত্রি উঠে দাঁড়াল।

সুরমা হারিকেন জ্বলিয়ে রান্নাঘরেই বসে আছেন। রাত্রি ছায়ার মত রান্নাঘরে এসে ঢুকল। কাঁপা গলায় বলল, মা, তুমি উনার হাত ধরে একটু বসে থাক। উনি বারবার তার মাকে ডাকছেন।

সুরমা নড়লেন না। হারিকেনের দিকে তাকিয়ে বসেই রইলেন। রাত্রি বলল, মা এখন আমরা কি করব?

সুরমা ফিসফিস করে বললেন, কিছু বুঝতে পারছি না।

হাওয়ার ঝাপটায় হারিকেনের আলো কাপছে। বিচিত্র সব নকশা তৈরি হচ্ছে দেয়ালে। প্রচণ্ড শব্দে কাছেই কোথাও যেন বাজ পড়ল। মতিন সাহেব ও-ঘর থেকে চেঁচাচ্ছেন – আলো দিয়ে যাচ্ছ না কেন? হয়েছে কি সবার? ভয় পেয়ে অপালা তার ঘরে কাঁদতে শুরু করেছে। কি ভয়ংকর একটি রাত। কি ভয়ংকর!

গত দেড় ঘণ্টা যাবত আশফাক একটা চেয়ারে জড়সড় হয়ে বসে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার কোনো বোধশক্তি নেই। চারপাশে কোথায় কি ঘটছে। সে সম্পর্কেও কোনো আগ্রহ নেই। তার সামনে একজন মিলিটারি অফিসার বসে আছেন। অফিসারটির গায়ে কোন ইউনিফর্ম নেই। লম্বা কোর্তার মত একটা পোশাক। ইউনিফর্ম না থাকায় তার র্যাংক বোঝা যাচ্ছে না। বয়স দেখে মনে হয় মেজর কিংবা ল্যাফটেনেন্ট কর্নেল। জুলপির কাছে কিছু চুল পাকা।

চেহারা রাজপুত্রের মত। কথা বলে নিচু গলায়। খুব কফি খাওয়ার অভ্যেস। আশফাক লক্ষ্য করছে এই এক ঘণ্টায় সে ছয় কাঁপের মত কফি খেয়েছে। কফি খাওয়ার ধরনটিও বিচিত্র। কয়েক চুমুক দিয়ে রেখে দিচ্ছে। এবং নতুন আরেক কাপ দিতে বলছে। এখন পর্যন্ত আশফাকের সাথে তার কোনো কথা হয়নি। আশফাক বসে আছে। অফিসারটি কফিতে চুমুক দিচ্ছে এবং নিজের মনে কি সব লেখালেখি করছে। মনে হচ্ছে। আশফাক সম্পর্কে তার কোনো উৎসাহ নেই।

ঘরটি খুবই ছোট। তবে মেঝেতে কার্পেট আছে। দরজায় ফুল তোলা পর্দা। অফিস ঘরের জন্যে পর্দাগুলি মানাচ্ছে না। কার্পেটের রঙের সঙ্গেও মিশ খাচ্ছে না। কাঁপেট লাল রঙের, পর্দা দু'টি নীল। আশফাক বসে বসে পর্দায় কতগুলি ফুল আছে তা গোণার চেষ্টা করছে। তার প্রচণ্ড সিগারেটের তৃষ্ণা হচ্ছে। সিগারেট আছে সঙ্গে, তবে ধরাবার সাহস হচ্ছে না।

মিলিটারি অফিসারটির কাজ মনে হয় শেষ হয়েছে। সে ফাইল পত্র একপাশে সরিয়ে রেখে আশফাকের দিকে তাকিয়ে চমৎকার ইংরেজিতে বলল, কফি খাবে? ঝড়বৃষ্টিতে কফি ভালই লাগবে।

আশফাক কোনো উত্তর দিল না।

আশফাক তোমার নাম?

হ্যাঁ।

তোমার গাড়িতে যে দু'টি ডেড বডি পাওয়া গেছে। ওদের নাম কি?

আশফাক নাম বলল। অফিসারটির মনে হল নামের প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই। সে হাই তুলে উঁচু গলায় দুকাপ কফি দিতে বলল। কফি চলে এল সঙ্গে সঙ্গেই।

খাও, কফি খাও। আমার নাম রাকিব। মেজর রাকিব। আমি কফিতে দুধ চিনি খাই না। তোমারটাতেও দুধ চিনি নেই। লাগলে বলবে। তুমি সিগারেট খাও?

হ্যাঁ।

তাহলে সিগারেট ধরাও। স্মোকাররা সিগারেট ছাড়া কফি খেতে পারে না।

আশফাক কফিতে চুমুক দিল। চমৎকার কফি। সিগারেট ধরাল। ভাল লাগছে সিগারেট টানতে। মেজর রাকিব তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। তার চোখ দু'টি হাসি হাসি।

আশফাক।

বলুন।

আমরা দু'জন পনেরো মিনিটের মধ্যে এখান থেকে বেরুব। ঝড়টা কমার জন্যে অপেক্ষা করছি। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে এবং তোমার সহকর্মীরা যেসব জায়গায় থাকে। সেসব আমাদের দেখিয়ে দেবে। আমরা আজ রাতের মধ্যেই সবাইকে ধরে ফেলব।

আশফাক তাকিয়ে রইল।

তোমার সাহায্য আমি মনে রাখব। এইটুকু শুধু তোমাকে বলছি।

আশফাক নিচু গলায় বলল, ওরা কোথায় থাকে আমি জানি না। মেজর রাকিব। এমন ভাব করল যে সে এই কথাটি শুনতে পায়নি। হাসি হাসি মুখে বলল, কেউ কথা না বলতে চাইলে আমাদের বেশ কিছু পদ্ধতি আছে। কিছু কিছু পদ্ধতি বেশ মজার। একটা তোমাকে বলি। এক বুড়োকে আমরা ধরলাম গত সপ্তাহে। আমার ধারণা হল সে কিছু খবরাখবর জানে। ভাব দেখে মনে হল কিছু বলবে না। আমি তখন ওর মেয়েটিকে ধরে আনলাম এবং বললাম, মুখ না খুললে আমার একজন জোয়ান তোমার সামনে মেয়েটিকে রেপ করবে। পাঁচ মিনিট সময়। এর মধ্যে ঠিক কর বলবে কি বলবে না। বুড়ো এক মিনিটের মাথায় কথা বলতে শুরু করল।

আশফাক বলল, স্যার আমি কারোরই ঠিকানা জানি না।

এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

এরা আমার কাছে এসেছে, আমি ওদের গাড়ি করে নিয়ে গিয়েছি। আমি নিজেও মুক্তিযোদ্ধা না।

ওরা তোমাকে জোর করে নিয়ে গেছে, তাই না? গান পয়েন্টে না গেলে তোমাকে ওরা গুলি করে মেরে ফেলত?

জি।

নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তুমি এই কাজটি করেছ।

জি স্যার।

তা তো করবেই। গান পয়েন্টে কেউ কিছু বললে না। শুনে উপায় নেই। শুনতেই হয়।

মেজর রাকিব আরেক কাপ কফির কথা বলল। কফি নিয়ে যে লোকটি ঢুকাল তাকে বলল, তুমি একে নিয়ে যাও। ওর দু'টি আঙুল ভেঙে আমার কাছে নিয়ে আসা। বেশি ব্যথা দিও না।

রাকিব হাসিমুখে তাকাল আশফাকের দিকে এবং নরম গলায় বলল, তুমি ওর সঙ্গে যাও। এবং শুনে রাখা এখন বাজে নটা কুড়ি, তুমি নটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে প্রচুর কথা বলবে। সবার বাড়ি দেখিয়ে দেবে। ধরিয়ে দেবে। আমি এই নিয়ে তোমার সঙ্গে দশ হাজার টাকা বাজি রাখতে পারি।

যে লোকটি আশফাকের ডান হাত নিজের মুঠোয় ধরে রেখেছে তার মুখ গোলাকার। এ রকম গোল মানুষের মুখ হয়? যেন কম্পাস দিয়ে মুখটি আঁকা। তার হাতটিও মেয়েদের হাতের মত তুলতুলে নরম। লোকটি পেনসিলের মত সাইজের একটি কাঠি। আশফাকের দুআঙুলের ফাকে রাখল। আশফাকের মনে হচ্ছে এটা একটা স্বপ্নদৃশ্য। বাস্তবে এ রকম কিছু ঘটছে না। গোলাকার মুখের এ লোকটি তার হাত নিয়ে খেলা করছে। আশফাক নিজেই বুঝতে পারল না যে সে পশুর মত আঁ আঁ করে চিৎকার করে উঠেছে। কেউ কী টেনে তার হাতটি ছিঁড়ে ফেলেছে? কী করছে এরা? কী করছে? তীব্র তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা। দ্বিতীয়বারের মত চিৎকার করেই সে জ্ঞান হারাল।

মেজর রাকিব তাকিয়ে আছে তার দিকে। কি সুন্দর চেহারা এই লোকটির! নাদিমের সঙ্গে মিল আছে। নাকটা লম্বা।

আশফাক, তোমার জ্ঞান ফিরেছে মনে হচ্ছে। ভালই হয়েছে। গাড়ি এসে গেছে। চল, যাওয়া যাক। নাকি যাবার আগে আরেক কাপ কফি খাবে?

আশফাক তাকিয়ে আছে। লোকটি নাদিমের মত লম্বা নয়। একটু খাট। বড়জোর পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি।

আশফাক, তুমি ওদের ঠিকানা জান নিশ্চয়ই। জানি না?

কয়েকজনের জানি। সবার জানি না।

ওতেই হবে। ব্যাপারটা হচ্ছে মাকড়সার জালের মত। একটা সুতার সন্ধান পাওয়া গেলে জালটা খুঁজে পাওয়া যায়। আশফাক।

বলুন!

চল, রওনা হওয়া যাক।

আমি আপনাকে কিছুই বলব না।

কিছুই বলবে না?

না।

মাত্র দু'টি আঙুল তোমার ভাঙা হয়েছে। তোমার হাতে আরো আটটি আঙুল আছে।

আমি কিছুই বলব না।

তোমার মাথা গরম হয়ে গেছে। অনেক সময় ব্যথার পরিমাণ বেশি হলে মাথা গরম হয়ে যায়। তুমি মাথা ঠাণ্ডা কর। কফি খাও, সিগারেট খাও। তারপর আমরা কথা বলব। নাকি সলিড় কিছু খাবে? গোশত পরোটা?

আশফাক কিছু বলল না। সে তাকিয়ে আছে তার বা হাতের দিকে। মুহূর্তের মধ্যে কেমন ফুলে উঠেছে। একি সত্যি তার হাত?

আশফাক গোশত, পরটা খুব আগ্রহ করে খেল। তার এতটা ক্ষিধে পেয়েছিল সে নিজেও বুঝতে পারেনি। ঝাল দিয়ে রান্না করা গোশত। চমৎকার লাগছে। পশ্চিমারা এতটা ঝাল খায় তার জানা ছিল না।

আশফাক!

জি।

আরো লাগবে?

জি না।

কফি চলবে?

একটা পান খাব।

পান খাওয়া যাবে না। দোকানপাট বন্ধ। এখন কার্ফু চলছে। সিগারেট আছে তো? না থাকলে বল।

জি আছে।

চল, তাহলে রওনা দেওয়া যাক।

কোথায়?

তুমি তোমার বন্ধুদের দেখিয়ে দেবে। বাড়ি চিনিয়ে দেবে।

আশফাক অনেক কষ্টে এক হাতে দেয়াশলাই জ্বলিয়ে সিগারেট ধরাল। অনেকখানি সময় নিয়ে ধোয়া ছাড়ল। বেশ লাগছে সিগারেট।

মেজর সাহেব।

বল।

আমি কিছুই বলব না।

কিছুই বলবে না?

জি না। আপনি তো আমাকে মেরেই ফেলবেন। মারেন। কষ্ট দেবেন না। কষ্ট দেয়া ঠিক না।

মরতে ভয় পাও না?

জি পাই। কিন্তু কি করব বলেন। উপায় কি?

উপায় আছে। ধরিয়ে দাও ওদের। আমি তোমাকে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করব। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই গ্যারান্টি তোমাকে দিচ্ছি।

মেজর সাহেব, এটা সম্ভব না।

সম্ভব না?

জি না। আমি তো মানুষের বাচ্চা। কুকুর বিড়ালের বাচ্চা তো না।

তুমি মানুষের বাচ্চা?

জি, আমাকে কষ্ট দেবেন না মেজর সাহেব। মেরে ফেলতে বলেন। কষ্ট সহ্য করতে পারি না।

মেজর রাকিব। দীর্ঘ সময় তাকিয়ে রইল। এই ছেলেটির যাবতীয় যন্ত্রণার অবসান করবার জন্যে তার ইচ্ছা করছে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। খবর বের করতেই হবে। এটা একটা মাকড়সার জাল। একটা সুতা পাওয়া গেছে। জালটিও পাওয়া যাবে। যেতেই হবে। মানুষ আসলে একটি দুর্বল প্রাণী। মেজর রাকিব আশফাকের আরো দু'টি আঙুল ভেঙে ফেলার হুঁকুম দিয়ে নিজের ঘরে এসে বসল।

বাইরে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে।

রাত এগারোটায় টেলিফোন। নাসিমা ভয়ে ভয়ে টেলিফোন ধরলেন।

কে?

ফুফু, আমি।

কী ব্যাপার রাত্রি? গলা এরকম শুনাচ্ছে কেন? কী হয়েছে?

কিছু হয়নি। ফুফু, তোমার কাছে যে একজন ভদ্রমহিলা এসেছিলেন। মেডিকেল কলেজের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর মিসেস রাবেয়া করিম, উনার টেলিফোন নম্বর দাও।

কেন?

খুব দরকার ফুফু। তুমি দাও।

কী হয়েছে বলা?

বলছি। নম্বরটা দাও আগে। তোমার পায়ে পড়ি ফুফু।

নাসিমা অবাক হয়ে শুনলেন রাত্রি ফুপিয়ে কাঁদছে। তিনি নম্বর এনে দিলেন।

সেই নম্বরে বারবার টেলিফোন করেও কাউকে পাওয়া গেল না। রিং হচ্ছে, কেউ ধরছে না।

মতিন সাহেব ঠিক একই ভঙ্গিতে কাঁধ চেপে ধরে আছেন। তার ধারণা রক্ত বন্ধ হয়েছে। তিনি মনে মনে সারাক্ষণ সুরা এখলাস পড়ছেন।

আলম এখন আর পানি খেতে চাচ্ছে না। খানিকটা আচ্ছন্নের মত হয়ে পড়েছে। সুরমা এক কাঁপা গরম দুধ খাওয়াতে চেষ্টা করলেন। এটা সে খেতে পারল বলে মনে হল।

তার জ্ঞান আছে। ডাকলে সাড়া দেয়। চোখ মেলে তাকায়। সেই চোখ টকটকে লাল।

মতিন সাহেব বললেন, মাথায় জলপট্টি দেয়া দরকার। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। সুরমা ভেজা তোয়ালে নিয়ে এস।

ভেজা তোয়ালে দিয়ে কপাল স্পর্শ করতেই আলম কেঁপে উঠল। সুরমা মৃদু স্বরে বললেন, বাবা, এখন রাত দুটো বাজে। ভোর হতে বেশি বাকি নেই। ভোর হলেই যে ভাবেই হোক তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। তুমি শক্ত থাক।

আশফাক তাকিয়ে আছে। শূন্য দৃষ্টিতে। মেজর রাকিবের মুখ এমন গোলাকার লাগছে কেন? তার মুখ তো এমন ছিল না। গোল মুখ ছিল ঐ লোকটির যে আঙুল ভাঙে। ভাঙার সময় কেমন টুক করে শব্দ হয়।

আশফাক।

জি।

চিনতে পারছ আমাকে?

জি। আপনি মেজর রাকিব।

তুমি কী এখন বলবে?

জি না। মেজর সাহেব, আপনি আমাকে মেরে ফেলেন, কষ্ট দেবেন না।

মেজর রাকিব তাকিয়ে রইল। এই ছেলেটি কোনো কথা বলবে না। এ বিষয়ে সে এখন নিঃসন্দেহ। তার প্রচণ্ড রাগ হওয়া উচিত। কিন্তু কেন জানি হতে পারছে না। সে ঠাণ্ডা গলায় বলল, তুমি কী কিছু খেতে চাও? কফি কিংবা সিগারেট? খেতে চাইলে খেতে পার। চাও কিছু?

জি না। ধন্যবাদ মেজর সাহেব। বহুত শুকরিয়া।

আশফাক।

জি।

তুমি কী বিবাহিত?

জি স্যার।

ছেলে মেয়ে আছে?

জি না।

নতুন বিয়ে?

জি।

স্ত্রীকে ভালবাস?

আশফাক জবাব দিল না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। মেজর রাকিব সহজ ভঙ্গিতে বলল, জবাব দাও। ভালবাস?

জি স্যার।

তাহলে তো ওর জন্যেই বেঁচে থাকা উচিত। উচিত নয় কী?

জি, উচিত।

তাহলে বোকামি করছি কেন? তোমার কী ধারণা কয়েকটি ছেলে ধরা পড়লে যুদ্ধ বন্ধ হযে যাবে? তা তো না। নতুন নতুন ছেলে আসবে। এবং কে জানে এক সময় যুদ্ধে তোমরা জিতেও যেতে পার। পার না?

জি স্যার, পারি।

নিজের জীবনের চেয়ে মূল্যবান আর কিছুই নেই। এটা একটা সহজ সত্য। তুমি নেই তার মানে তোমার কাছে পৃথিবীর কোনো অস্তিত্ব নেই–দেশ তো অনেক দুরের কথা। আমি কী ঠিক বলছি?

জি স্যার, ঠিক।

বেশ এখন তুমি কথা বল। চল আমার সঙ্গে। শুধুমাত্র একজনকে ধরিয়ে দাও। আমি কথা দিচ্ছি, ভোরবেলায় তোমাকে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করব।

আশফাক অনেকক্ষণ মেজর রাকিবের দিকে তাকিয়ে রইল। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তাকাল তার ফুলে উঠা হাতের দিকে। আহ কী অসম্ভব যন্ত্রণা। যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে ইচ্ছা! করে। খুবই ইচ্ছা করে।

চল, আশফাক। চল। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

স্যার, আমি কিছু বলব না।

বলবে না?

জি না।

দু'জন দীর্ঘ সময় দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল। মেজর রাকিব বেল টিপে কাকে যেন ডাকল। শীতল গলায় আশফাককে মেরে ফেলবার নির্দেশ দিল। আশফাক বিড়বিড় করে বলল, স্যার যাই। স্নামালিকুম।

আলম কোন সাড়া শব্দ করছে না। তার পা আগুনের মত গরম। কিছুক্ষণ আগেও ছটফট করছিল। এখন সে ছটফটানি নেই। একবার শুধু বলল, পানি খাব। পানি দিন।

মতিন সাহেব চামচে করে পানি দিলেন। সে পানি খেল না। মুখ ফিরিয়ে নিল।

পানি চেয়েছিলে তুমি। একটু হা কর।

না।

ব্যথা কী খুব বেশি?

না বেশি না।

মতিন সাহেব চিন্তিত বোধ করলেন। হঠাৎ করে ব্যথা কমে যাবে কেন? এর মানে কী?

আলম! আলম!

জি।

ভোর হতে খুব দেরি নাই। তোমার আত্মীয়-স্বজন কাকে খবর দেব বল তো।

আলম জবাব দিল না। মতিন সাহেব এই প্রশ্নটি দ্বিতীয়বার করলেন। আলম বলল, কাউকে বলতে হবে না।

কেন বলতে হবে না। নিশ্চয়ই বলতে হবে।

কেন বিরক্ত করছেন?

মতিন সাহেব চুপ করে গেলেন।

আলম বিড়বিড় করে বলল, আমার মাথার নিচে আরেকটা বালিশ দিন।

তার কাছে মনে হচ্ছে তার মাথা ক্রমেই নিচে নেমে যাচ্ছে। টেনে কেউ তাকে নিয়ে যাচ্ছে অতলান্তিক জলে। কিছুতেই ভাসিয়ে রাখা যাচ্ছে না। ঘরবাড়ি অচেনা হয়ে যাচ্ছে। সে কী মারা যাচ্ছে! মরবার আগে সমস্ত অতীত স্মৃতি নাকি ঝলসে ওঠে। কই সে রকম তো কিছু হচ্ছে না। চোখের সামনে কিছুই ভাসছে না। কোন স্মৃতি নেই। চেষ্টা করেও কোনো কিছু মনে করা যাচ্ছ না। যতবার সে কিছু মনে করবার চেষ্টা করছে ততবারই সাদেকের মুখ ভেসে উঠছে। নূরুর মুখের ছবি আসছে না। অথচ গাড়ি থেকে বের হবার সময় সে এই দুজনের দিকেই তাকিয়ে ছিল। তার চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে নূরুকে সে অনেক বেশি পছন্দ করে। অনেক বেশি। কী ঠাণ্ডা একটা ছেলে। বয়স কত হবে? কুড়ি একুশ? তার চেয়েও কম হতে পারে। কোনোদিন জিজ্ঞেস করা হয়নি। জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল।

মতিন সাহেব।

কী বাবা?

আমাদের সঙ্গে দু'টি ছেলে ছিল। ওরা মারা গেছে।

বাবা, তুমি চুপ করে থাক। কথা বলবে না। কোনো কথা বলবে না।

পানি খাব।

বিন্তি এক চামচ পানি দিল মুখে। রাত্রি এসে দাঁড়িয়েছে। দরজার পাশে। সেখানে থেকেই সে বলল, আপনার কী এখন একটু ভাল লাগছে? রাত সাড়ে তিনটা, সকাল হতে বেশি বাকি নেই।

আলমের মাথা আবার কেমন ভারী হয়ে যাচ্ছে। সে কী আবার তলিয়ে যেতে শুরু করেছে? কিন্তু সে তলিয়ে যেতে চায় না। জেগে থাকতে হবে। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে।

পাশা ভাইও এ রকম গুলি খেয়েছিল। গুলি লেগেছিল পেটে। ভয়াবহ অবস্থা। কিন্তু পাশা ভাই ছিলেন ইস্পাতের মত। মৃত্যুর আগ মুহূর্তেও বললেন–আমাকে মেরে ফেলা এত সহজ না। সামান্য একটা সিসার গুলি আমাকে মেরে ফেলবে। পাগল হয়েছিস তোরা? বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সুচাগ্র মেদিনী। কথায় কথায় কবিতা বলতেন। ছড়া বলতেন। দেশের সেরা সন্তানদের আমরা হারাচ্ছি। এরা দেশের শ্রেষ্ঠতম ফসল। এই দেশ বীর প্রসবিনী।

রাত্রির পাশে তার মা এসে দাঁড়িয়েছেন। কী করুণ লাগছে ভদ্রমহিলার মুখ। আলম একবার ভাবল বলবে, আপনাদের অনেক ঝামেলায় ফেললাম। কিন্তু বলা গেল না। বললে নাটকীয় শোনাবে। বাড়তি নাটকের এখন কোনো দরকার নেই। আলম বলল, ক'টা বাজে?

তিনটা পঁয়ত্রিশ।

মাত্র পাঁচ মিনিট গিয়াছে? সময় কী থেমে গেছে? কে একজন ছিল না যে সময়কে থামিয়ে দিয়েছিল? কী নাম যেন? মহাবীর থর? না অন্য কেউ? সব এলোমোলো হয়ে যাচ্ছে। আবার সাদেকের মুখটা ভাসছে। মৃত মানুষদের কথা এখন আমি ভাবতেই চাই না। কিছুতেই না। আমি ভাবতে চাই জীবিত মানুষদের কথা। মার কথা ভাবতে চাই। বোনের কথা ভাবতে চাই। এবং এই মেয়েটির কথাও ভাবতে চাই। রাত্রি! কী অদ্ভুত না।

আলম পাশ ফিরতে চেষ্টা করল। সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল তীব্র তীক্ষ্ণ ব্যথা। আবার সে ডুবে যেতে শুরু করেছে। সে বিড়বিড় করে বলল, মতিন সাহেব মাথাটা একটু উঁচু করে দিন।

রাত্রি একা একা বারান্দায় বসে আছে। সে তাকিয়ে আছে নারকেল গাছের দিকে। সেখানে বেশ কিছু জোনাকি ঝিকমিক করছে। শহরেও জোনাকি আছে তার জানা ছিল না।

ভাল লাগছে। ওদরে দিকে তাকিয়ে থাকতে।

পাশের বাড়িতে দোতলা ফ্ল্যাটে একটি ছোট বাচ্চা কাঁদছে। তার মা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না।

আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। একটি দু'টি করে তারা ফুটতে শুরু করেছে। রাত্রি লক্ষ্য করল আকাশের তারার সঙ্গে জোনাকিদের চমৎকার মিল আছে।

বাচ্চাটা কান্না থামিয়েছে। হয়ত দুধ বানিয়ে দিয়েছে তার মা। নিশ্চিত হয়ে ঘুমুচ্ছে। আহ শিশুরা কত সুখী।

সুরমা বারান্দায় এসে তাকালেন মেয়ের দিকে। তাঁর বুক ধক কবে একটা একটা ধাক্কা লাগল। রাত্রি!

কী মা?

এক একা বসে আছিস কেন?

রাত্রি জবাব দিল না। তাকিয়ে রইল জোনাকিব দিকে। সুরমা ক্লান্ত স্বরে বললেন, ভোব হতে দেরি নেই।

রাত্রি ঠিক আগের মতই বসে রইল। সুরমা বললেন, তুই চিন্তা করিস না। আমার মনে হয় ও সুস্থ হয়ে উঠবে। তোর মনে হয় না?

আমার কিছু মনে-টনে হয় না।

বলতে গিয়ে রাত্রির গলা ধরে গেল। ইচ্ছা করল চেঁচিয়ে কেঁদে উঠতে।

সুরমা বসলেন মেয়ের পাশে। একটি হাত রাখলেন তার পিঠে। অস্বাভাবিক কোমল স্বরে বললেন, দেশ স্বাধীন হয়ে যাবার পর আমি আলমের মার কাছে গিয়ে বলব চরম দুঃসময়ে আমরা আপনার ছেলের কাছে ছিলাম। তার ওপর আমাদের দাবি আছে। এই ছেলেটিকে আপনি আমায় দিয়ে দিন।

দুজনে অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না–রাত্রির চোখ দিয়ে ক্রমাগত জল পড়তে লাগল। সুরমা মেয়েকে কাছে টানলেন। চুমু খেলেন তার ভেজা গালে।

রাত্রি ফিসফিস করে বলল, জোনাকিগুলিকে আর দেখা যাচ্ছে না কেন মা?

জোনাকি দেখা যাচ্ছে না। কারণ ভোর হচ্ছে। আকাশ ফর্সা হতে শুরু করছে। গাছে গাছে পাখপাখালি ডানা ঝাপ্টাচ্ছে। জোনাকিদের এখন আর প্রয়োজন নেই।